সমুদ্রে যেতে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই
আমি নির্বিকার থাকতে চাই
সাধারণ্যে বিলীন হতে চাই

– মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

সিদীপ ২০১৪ সালের 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসাবে ১০ম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কারে ভূষিত হয়। এই পুরস্কার সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। ঐ বছর ২ আগস্ট বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সংস্থার পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান-এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০১৭ সালে ১২তম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার লাভ করেছিলেন সিদীপের দুজন সদস্য। শ্রেষ্ঠ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন মুন্সীগঞ্জ সদরের ঘর-নির্মাতা রুমা আক্তার এবং শ্রেষ্ঠ তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছিলেন পাবনায় বেড়ার রাজর্ষী পেপারস এন্ড স্টেশনারি ফ্যাক্টরির তাইফুর রহমান রাজু। ১৫ এপ্রিল ঢাকায় ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান ও সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব সীতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে জনাব রুমা ও রাজুকে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মঞ্চে পরিচয় করিয়ে দেন।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

শিক্ষালোক

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০ ● ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচি

বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ - আশরাফ আহমেদ	৪
বন্ধু ইয়াহিয়া - ড. আব্বাস ভূঁইয়া	৫
স্মৃতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন - শফিকুল ইসলাম	৬
একটি ধ্রুবতারার পতন - মো. এনামুল হক	৯
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া: জীবন ও কর্ম - সালেহা বেগম	১৩
A son of the soil - Mizanur Rahman	১৫
মানব-উন্নয়নে নিবেদিত ছিলো যে প্রাণ - আলমগীর খান	১৭
একজন উন্নয়ন পথিকৃৎ - মনজুর শামস	১৯
তিনি থাকবেন চির অমলিন - মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম	২২
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক প্রকাশ	২৩
নিবেদিত পংক্তিমালা	২৬
মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার একগুচ্ছ কবিতা	২৮
অস্তিত্ব-জাগানিয়া অর্থনীতি - শাহজাহান ভূঁইয়া	৩২
করোনা-দুর্যোগে কৃষকের পাশে দাঁড়াতে হবে	৩৩
করোনাকালের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ - অলোক আচার্য	৩৪
মেধা ও প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত মঞ্চ	৩৫
শিক্ষা কর্মসূচির সাংস্কৃতিক উৎসবে - জান্নাতুল ফেরদৌস	৩৬
আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা - নাহিদা হক	৩৭
শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন-২০২০	৩৮
ভার্চুয়াল শোক ও স্মরণ সভা	৩৯

সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

এই সম্পাদকীয়টি যার লিখবার কথা সেই প্রাণোচ্ছল সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষালোক বুলেটিনের প্রথম সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আজ আমাদের মাঝে নেই। কভিড-১৯এ আক্রান্ত হয়ে তিনি এ বছর ২২ আগস্ট আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কর্মচঞ্চল, দেশের প্রান্তিক তৃণমূল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায় প্রাণিত, উদ্ভাবনী চিন্তায় ও কর্মে পরমোৎসাহী, অকৃত্রিম বন্ধুবৎসল, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল এবং শিল্প-সাহিত্যের আজীবন অনুরাগী মহান এক মানুষকে হঠাৎ হারিয়েছি আমরা। দেশ হারিয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্বকে যিনি উন্নয়নক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রমী, সৎ, নিষ্ঠাবান, প্রচারবিমুখ, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। সিদীপ সংস্থার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক। আজ এ সংস্থা যখন যৌবনময় তখনই তিনি চিরতরে চলে গেলেন। তবে আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর চিন্তা, কর্ম ও আদর্শকে এগিয়ে নেয়ার পথ ও গুরু দায়িত্ব।

বিশ্বজুড়ে করোনাসংকটের কারণে আমরা অনেকদিন পর শিক্ষালোক বের করছি। আমাদের অকাল প্রয়াত এ অভিভাবকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে প্রকাশিত হচ্ছে এ বুলেটিনের চলতি সংখ্যা। বিষয় ও গুরুত্বের কারণে একটি ইংরেজি লেখাও এতে অন্তর্ভুক্ত হলো। তাঁর কাজ ও স্মৃতিকে ধরে রাখতে পরবর্তীতে আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

ব্যক্তি, কর্মবীর, ব্যতিক্রমী উন্নয়ন-চিন্তক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে কিছুটা জানতে হয়তো পাঠকের জন্য সহায়ক হবে শিক্ষালোক বুলেটিনের এ সংখ্যাটি। চলতি করোনা-সংকটকালে সংস্থার কিছু কাজের কথাও থাকছে। সবশেষে শোক আমাদের শক্তিতে পরিণত হোক–এই প্রত্যাশা।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@gmail.com, web: www.cdipbd.org

উন্নয়নের জন্য
বাংলাদেশের সার্বজনিন
শিক্ষা এবং উন্নত জনবলের
কোন বিকল্প নেই

ছবির মাঝে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, তাঁর ডানে তাঁর সহধর্মিণী ও বামে লেখক

বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ

আশরাফ আহমেদ

বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আমার চলা এতো বন্ধুর হতে পারে আগে তা বুঝতে পারিনি!

আগস্টের আট তারিখ তোমার পাঠানো 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' রবীন্দ্রনাথের গানের লিংকটি পেয়েই ফোন করেছিলাম। জ্বর ও কাশি নিয়ে তুমি কথা বলছিলে। তখনো জানতে না উপসর্গটি ছিল করোনা রোগের। গানটির কথা বলতে গিয়ে তুমি স্মৃতিকাতর হয়ে গিয়েছিলে। পাঁচ দশক আগে ফজলুল হক হলে থাকার সময় এই গানটি শোনানোর জন্য তুমি আমাকে অনুনয় করতে। এর ঠিক দুই সপ্তাহের মাঝেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তা আমি কল্পনা করতে না পারলেও তুমি ঠিকই বুঝেছিলে। তাই গানটির মর্মবাণী নিয়ে আলোচনা এবং আমাদের সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছিলে।

বন্ধু হে, তোমাকে হারানোর পর সেই কথা মনে হলে হৃদয় আমার চৌচির হয়ে যায়! তখন কেন তোমার সাথে আরো দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম না! ফেসবুকে বা অন্যত্র প্রকাশের আগে আমার কোন লেখাটিতে তোমার মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেনি অথবা আশীর্বাদপুষ্ট হয়নি? শেষবারের মতো দারুণ উৎসাহ নিয়ে বলেছিলে আমার মা-বাবার চিঠিগুলো নিয়ে যেন একটি পাণ্ডুলিপি লিখি। আমি ছিলাম এক কারণিক, তুমি ছিলে আমার লেখার আত্মা। আজ আত্মাটি আমার মরে গেছে। এখন আমি কি নিয়ে বাঁচি?

তোমার সাথে আমার শেষ কথা স্মরণ করে পুরনো এলবাম খুঁজে কিছু ছবি পেলাম। ফজলুল হক হলের ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে আমাদের র‍্যাগ ডে'র। দিনটি উদযাপনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলে তুমি। তোমার সেই উদাত্ত হাসি, প্রাণচাঞ্চল্য, এবং বন্ধুবাৎসল্য হলের কোন ছাত্রটিকে তোমার আপন করে নেয়নি? দেশি বা বিদেশি আর্থিক দান বা অনুদান ছাড়া সম্পূর্ণ দেশিয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে মাত্র পঁচিশ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মীর একটি সেবামূলক সংস্থা তোমার মতো আর ক'জন লোক গড়ে তুলতে পেরেছে? দেশের ভাগ্যাহত ষাট হাজার শিশুর জন্য আড়াই হাজার স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা করে দেশব্যাপী তুমি যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছো পৃথিবীর কয়টি লোক তা চিন্তা করতে পেরেছে? এনজিও সংক্রান্ত এতো কিছুর পরও তোমার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক পড়াশোনা এবং লেখালেখি করা লোক বাংলাদেশে অল্পই পাওয়া যাবে।

অথচ আশ্চর্য, আত্মপ্রচারণা এবং সাংবাদিকদের তুমি সবসময় এড়িয়ে চলেছো। তোমার মৃত্যু-সংবাদ জানানোর জন্য ভালো কোনো ফটো পাওয়া যায়নি! 'শিক্ষালোক' নামে নিজস্ব একটি প্রকাশনা থাকলেও তাতে তোমার একক ভালো কোনো ছবি পাওয়া যায় নি। অথচ ফটোগ্রাফি ছিল তোমার সখ! 'পরলোকে' বসে তুমি দেখছো কিনা জানি না কিন্তু তোমার প্রচারবিমুখতা উল্লেখ করে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ লিখেছেন 'আমার দেখা বাংলাদেশের এনজিও খাতের নেতৃত্বদানকারি এবং তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন কাজে নিবেদিত প্রাণ মানুষদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব'। কিন্তু আমার কাছে তুমি ছিলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন।

আমরা তোমার কাছে অসীম কৃতজ্ঞ! তুমি যেখানেই থাকো, যেভাবেই থাকো, ভালো থেকো।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।

বন্ধু ইয়াহিয়া

ড. আব্বাস ভূঁইয়া

প্রথম পরিচয় ১৯৬৬ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে আইএসসি ক্লাসে সতীর্থ হিসাবে। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপি। বন্ধুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।

ছাত্রজীবনে সমাজের শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন নিয়ে কি করা যায় তা নিয়ে ভাবত। আইএসসি পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখানে অনার্সে ভর্তি হয়। ১৯৭৪এ এমএসসি পাশ করে। শুরু থেকেই কুমিল্লা প্রশিকার সাথে জড়িত ছিল। অনেকদিন কাজও করে। পরে চাকুরি নিয়ে বিদেশ চলে যায়।

আমি চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে আমাদের মাঝে যোগাযোগ ছিল না।

১৯৯৪ সনে মহাখালি অবকাশ হোটেলে এক ওয়ার্কশপে দেখা হয়। তখন জানতে পারলাম যে এখন থেকে সে দেশে থাকবে। সেই বছর ICDDR,B'র চকোরিয়া প্রজেক্টের external evaluation team-এর মেম্বার হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে রাজি হয়। ঐ কাজে ইয়াহিয়ার অসাধারণ অবদান ছিল। ওর পর্যবেক্ষণ নিয়ে সে Daily Star-এ একটা লেখাও প্রকাশ করে। তখন থেকে আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। চাকুরি না করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কথা ভাবতে শুরু করে। যার ফল আজকের সিদীপ।

ইয়াহিয়া ও সিদীপের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। সময় পেলেই সে গাড়ি নিয়ে চলে আসত। সালাউদ্দিনকে তুলে আমাকে তুলত। অনেক গল্প হত। অনেক উন্নয়ন বিষয় নিয়েও কথা হত। সিদীপ নিয়েও কথা হত। গল্পের মাঝে হাসি ঠাট্টা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গল্প। গল্পের মাঝে চট করে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের নতুন ধারণা প্রকাশ করত। বিদেশি অনুদান ছাড়াই গ্রামের অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন সম্ভব সেটা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। সিদীপকে সে পুরোপুরি সেভাবেই গড়ে তুলেছে।

(বাঁ থেকে) লেখক, গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির

অনেক স্মৃতি ইয়াহিয়ার সাথে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি ও ইসমত আমেরিকায় আসার পর তিন-চার বার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আসার আগে একদিন সালাউদ্দিন ও আমাকে নিয়ে বসুন্ধরা আই ব্লকে নিয়ে যায়। সিদীপের জন্য বড় ক্যাম্পাস দরকার হবে। আই ব্লকে কিছু প্লট বিক্রি হবে। সেগুলো দেখাতে নিয়ে গেছে।

আমি শুধু ১৯৭১এর যুদ্ধের সময় আমাকে বলা ইয়াহিয়ার একটা অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ করব। পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ইয়াহিয়াসহ ১৭/১৮ জন ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরই সবার সামনে গুলি করে এক একজনকে মারা শুরু করে। শেষ ৪/৫ জন জীবিতদের মধ্যে ইয়াহিয়া একজন। কোনদিন যে মেরে ফেলবে সেই ভয়ে দিন কাটাত। তবে যে সেনাগুলা ইয়াহিয়াকে বাসা থেকে ধরে আনে তার মধ্যে একজন ইয়াহিয়ার বাসায় পরেও যেত। কারণ সেই সেনার এক বোন আছে ইয়াহিয়ার এক বোনের বয়সের। সে বলছে যে সে কোনভাবেই ইয়হিয়াকে মারতে দিবে না। অবশেষে সেই সৈন্য তার কথা রেখেছে। ইয়াহিয়াকে জীবিত অবস্থায় বাসায় ফেরত দিয়ে আসে।

আশা করি সিদীপ ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে সযত্নে লালন করবে। আল্লাহ ইয়াহিয়ার আত্মাকে শান্তিতে রাখুক এই প্রার্থনা করি।

লেখক: চেয়ারম্যান, সিদীপ

সর্বডানে লেখক, তার পাশে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও সিদীপ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ (পর্ষদের ১০০তম সভা উপলক্ষে)

স্মৃতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন

শফিকুল ইসলাম

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জন্ম ১৯৫০ সালে এবং মৃত্যু ২২শে আগস্ট ২০২০ সালে। পিতা এ. কে. এম. নুরুল হুদা সাহেব বাঞ্ছারামপুর উপজেলার উজানচর কে. এন. উচ্চবিদ্যালয় থেকে অংকে লেটার মার্কসহ ১৯২১ সালে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় পোস্টাল বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। পিতার মেধার স্ফুরণ ঘটেছে ইয়াহিয়ার সকল ভাইবোনের মধ্যে। ছোট বোন রোজি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকের প্রফেসর; বড় ভাই ফজলুল বারি অ্যাগ্রোনমিতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পরিচালক পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে একটি এনজিওর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন।

তাদের পরিবারের সাথে আমার পরিচয় সেই ১৯৫৬ সালে, আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে ইয়াহিয়ার বড়বোনের বিবাহ সূত্র থেকে। দ্বিতীয়ত কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে কাজ করার সময় বারি ভাই ও আমি এবং আরও তিন সহকর্মী টমসমব্রীজের একাডেমির হাউজিং সোসাইটির একটি বাড়িতে মেস করে বসবাস করতাম। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সেই ভয়াল রাত্রিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনী মার্শাল ল জারি করার সময় আমরা সেই বাড়িতে আটকা পড়ি। ২৭শে মার্চ সকালবেলা রেডিওতে শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ডাক। সে ডাকে আমাদের অন্তরে আশার আলো জেগে উঠে। সকাল ১১টার সময় মাইকে ঘোষণা আসতে থাকে–দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। সেই সময়টুকুতে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম শাকতলার মৌলভী আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেই। পরদিন পুনরায় কারফিউ শিথিল করা হলে আমরা তদানীন্তন পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পরিচালক ড. মুঈদ সাহেবের গ্রামের বাড়ি শিমরায় আশ্রয় নেই। পরদিন সকালে সেখান থেকে হেঁটে আমি বাকি চারজনকে নিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি কসবা থানায় কালসার গ্রামে পৌঁছাই। বি-বাড়িয়া থেকে ইয়াহিয়া ও তাদের পরিবারের সদস্য আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম জমশেরপুরে পৌঁছায় তাদের খালার বাড়িতে।

১৯৭১ সাল ছিল ইয়াহিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিষয়ে পড়ার শেষ বর্ষ। ছাত্রজীবনে সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী। সে সময়েয় ছাত্ররাজনীতিতে ছাত্রদের দেশ ও বাঙালি জাতির মুক্তির চিন্তাচেতনার সাথে তার আত্মিক যোগ ছিল। সমাজের উন্নয়নের

চিন্তাও তার মধ্যে জাগ্রত ছিল। তার সাথে আলাপচারিতায় ঐ বিষয়গুলো উঠে আসতো। বোঝা যেত ছাত্র হলেও সে কিছু করার নানা পথ খুঁজছে। ছাত্রজীবন সমাপন করে বার্ডে কিছু করার একটি সুযোগ তৈরি হয়। পরিসংখ্যান ও অর্থনীতিতে পড়ুয়াদের তখন বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের সুযোগ ছিল বেশ। ইয়াহিয়া সে সুযোগটি কাজে লাগায়। পরে তারা কতিপয় বন্ধু মিলে 'কুমিল্লা প্রশিকা' নামক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করে কাজ আরম্ভ করে। তাদের কর্ম-এলাকা তদানীন্তন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় বিস্তৃত ছিল।

চিনাবাদাম চাষের সূচনা: ইউনিসেফ কুমিল্লার সাথে ইয়াহিয়ার মাধ্যমে চিনাবাদাম বীজ সম্প্রসারণ কর্মসূচি চালু করা হয় ১৯৭৭ সালে। এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে আমি ইউনিসেফ ফরিদপুর Unicef District Representative হিসেবে কাজে যোগদান করি। পদ্মার বিস্তীর্ণ চর এলাকায় চিনাবাদাম চাষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অনেকেই জানি বৎসরে চিনা বাদামের দুটি ফসল হয়: রবি, মার্চ-এপ্রিল থেকে এবং খরিফ, অক্টোবর-নভেম্বর থেকে। এ ফসলের ক্রিটিক্যাল দিক হলো রবির ফসল থেকে খরিফের বীজ সংরক্ষণ করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন দেশ জুড়ে একটি Crop Rotation পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। ইউনিসেফ কুমিল্লার প্রতিনিধি মাহবুব শরীফের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ইয়াহিয়া ঐ কাজটি বাস্তবায়ন করতে থাকে।

চিনাবাদাম প্রকল্প পরিদর্শন: ১৯৮০ সালে আমি ইউনিসেফ কুমিল্লা অফিসে যোগদান করি এবং একদিন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী জনাব আজিজুল হক সাহেবের সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত CIRDAP অফিসে দেখা করতে যাই। তিনি চিনাবাদাম চাষপ্রকল্প নিয়ে উৎসাহী ছিলেন। Crop Rotation পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে জানতে চান। তৎক্ষণাৎ আমার ইয়াহিয়া কর্তৃক নাসিরনগর থানায় উড়াইল চিনাবাদাম সম্প্রসারণের উদ্যোগের কথা তাকে অবহিত করি। তাঁর সম্মতি নিয়ে আমরা কয়েকজন এক বিকেলে কুমিল্লা থেকে আশুগঞ্জ হয়ে লঞ্চযোগে ইয়াহিয়ার উড়াইল চিনাবাদাম চাষের উদ্যোগ দেখতে যাই। মাঠ থেকে আমরা চিনাবাদাম গাছ উঠিয়ে কুমিল্লায় ফেরত আসি। ঐটি ছিল একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। একজন সমন্বয়ক হিসেবে ইয়াহিয়ার ধৈর্য ও কৌশল দেখে CIRDAP-এর আজিজুল সাহেবসহ আমরা সবাই মুগ্ধ হই।

UNV (United Nations Volunteer)এ যোগদান: প্রশিকা ছেড়ে ইয়াহিয়া এ ক্যাডারে যোগদান করে আফ্রিকা মহাদেশে কাজের জন্য চলে যায়। সে জাম্বিয়া/দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে থাকে।

এরপর ইয়াহিয়া গ্রামীণব্যাংকে যোগদান করে। সেখান থেকে তরতর করে জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়। Microcredit এবং Microfinance-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে তার চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে।

কিন্তু তার মনের গহীনে যে আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিলো তা হলো সে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে। এর মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং সাথে সাথে বহু মানুষের জীবনবোধ সৃষ্টি হবে। তারা তাদের চাহিদা নিরূপণে সচেষ্ট হবে এবং স্বাবলম্বী হয়ে সম্মানজনক জীবনযাপনে অগ্রসর হবে।

ইয়াহিয়া এটাও বুঝতো তার প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য আস্থাভাজন ও দক্ষ মানুষ দরকার। এ কাজটি অতি সহজে তার ঘনিষ্ঠ সহপাঠিদের মধ্য থেকে পূর্ণ করে ফেলে। তারপরও ২/১ জন তাঁর পরিচিত গণ্ডির মধ্য থেকে নিয়ে আসে। তার স্বপ্নঘেরা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে গেছে। আমি তার গড়া প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকে তিন মেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে তার সম্বন্ধে কোন বিরূপ ধারণা কারও মধ্যে লক্ষ্য করিনি। তার মধ্যে নির্মল হাসি ও কথোপকথনের সময় রসবোধ সকলকে আকৃষ্ট করতো। আমি অবাক হই এই ভেবে, ২৫ বছরের একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে এত অর্জন সম্ভব করেছে। এই অর্জনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো হলো:

ক) কর্ম-এলাকা ২০টি জেলা, ১২৫টি উপজেলা, ১১৯৪টি ইউনিয়ন এবং ৫১৮৭টি গ্রামে সম্প্রসারণ।

খ) তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের নিকট পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ইত্যাদি কর্ম-এলাকার উপকারভোগীদের দৈনন্দিন অনুশীলন ও চর্চার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ঘ) পিকেএসএফের সহযোগিতায় তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি ইউনিয়নকে ভিক্ষকমুক্ত করেছে।

সিদীপ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগ: আমরা অবগত আছি ইউনিসেফ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় পল্লী এলাকায় হস্তচালিত নলকূপ স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রায় ৯৮% মানুষ নিরাপদ পানির নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু বাদ সাধে ১৯৯০ দশকে হঠাৎ করে কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি। এ কঠিন সমস্যা সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে এনজিওর মাধ্যমে নলকূপের পানির মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণের জন্য Field Test Kit দিয়ে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কাজটির জন্য সিদীপকে আহ্বান জানাই। ইয়াহিয়া বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় সকল নলকূপের পানি পরীক্ষা এবং মিটিগেশনের জন্য নবীনগর উপজেলায় নরসিংহপুর গ্রাম নির্বাচন করে। গ্রামটি তিতাস নদীর পাড়ে অবস্থিত। ইয়াহিয়ার পরিচিত একজন প্রকৌশলী এবং ইউনিসেফ থেকে আমি ও প্রকৌশলী আবু শাহজালাল আজাদ একাধিকবার ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে প্রকল্প এলাকাটি পরিদর্শন করি।

গ্রামটির ৪০০ পরিবারের মধ্যে ১৩৫টি পরিবারে Supply Water Connection দেয়া হয়। এইটি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

গ্রাম পর্যায়ে "নরসিংহপুর Surface Water Treatment Plant"টি ছিল বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম উদ্যোগ যার নেতৃত্ব দিয়েছিল ইয়াহিয়া। জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এহতেশামুল হক এ উদ্যোগটির টেকনিক্যাল দিকগুলো নিশ্চিত করেছিলেন। গ্রামটির ৪০০ পরিবারের মধ্যে ১৩৫টি পরিবারে supply water connection দেয়া হয়। এইটি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিউনিটির মালিকানায় গেলে ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ও অবহেলার কারণে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটি কোনোভাবে চলতে থাকে। ইয়াহিয়া আমাকে প্রায়ই স্মরণ করাতো এ কাজটি চালু রাখার ব্যবস্থা করার জন্য। এখানে উল্লেখ্য পিকেএসএফ-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এ প্রকল্পটি পরিদর্শন করে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। বর্তমানে স্থানীয় উদ্যোগে শুধু পানি সরবরাহের কাজটি চালু আছে। এখনও সুযোগ আছে এ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাটির আরেকটু উন্নয়ন ঘটানো এবং টেকসই করা।

ইয়াহিয়ার আর একটি স্বপ্ন সে নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করে গেছে। সেটা হলো শিশু শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা। সিদীপ যেহেতু নবধারা প্রচলনের রূপকল্প ধারণ করে সেজন্য শিশুশিক্ষায় বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের জন্যে শিক্ষায় এক নবধারা আনয়ন করে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে সে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি চালু করে। এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করা মেয়েদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ কর্মসূচিতে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার দায়িত্ব হলো গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের নির্বাচন করে কেন্দ্রটি পরিচালনা করা। এই শিশুশিক্ষায় সহায়তা কর্মসূচিটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু করা হয়েছে। শিক্ষায় সকলের অন্তর্ভুক্তি তার এক অনন্য স্বপ্ন ছিল। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে আড়াই হাজার শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। এ কর্মসূচির সৌন্দর্য হলো শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মেয়েরা সমাজে এক নতুন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা পায়।

এছাড়া ইয়াহিয়ার সুদূরপ্রসারী চিন্তার সাথে আর একটি প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ হলো "শিক্ষালোক" নামক একটি বুলেটিন প্রকাশ। প্রকাশনাটি এতই সমৃদ্ধ যে, যে কোন পাঠক একটি সংখ্যা হাতে পেলে পরবর্তী সংখ্যা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। অন্তত আমি থাকি।

ইয়াহিয়ার স্মৃতিচারণ আমি প্রলম্বিত করব না। তার চলে যাওয়ার সপ্তাহ খানেক পূর্বে মেসেঞ্জারে তাকে ফোন করি। ফোন পেয়ে অনেকটা প্রফুল্লচিত্তে আমাকে রোজকার মত সম্বোধন করে জবাব দিয়ে বলে, "বেনু ভাই, আপনি ফোন করে ভালই করেছেন। আমি ভালই আছি।" আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল তার স্ত্রী, আমার স্ত্রীর পক্ষের রঞ্জু খালা, কেমন আছেন। অনেকটা হাসিসম্বলিত কণ্ঠে বলে, রঞ্জু ভালই আছে। আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝি নাই এটাই ইয়াহিয়ার সাথে আমার শেষ কথোপকথন। তার সেই হাসি মুখটাই আমার সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি প্রার্থনা করি যে, আল্লাহপাক যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদাওস দান করেন। রঞ্জু খালা আপনি ও পরিবারের সকল সদস্য ভাল থাকুন– এই প্রার্থনা করি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত টিমলিডার, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

একটি ধ্রুবতারার পতন

মো. এনামুল হক

পৃথিবীতে কিছু উদার ও সৃজনশীল মানুষ আসে শুধু নিজের সামর্থ্যের সবটুকু বিলীন করে দেয়ার জন্য। যার চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না, নীরবে নিভৃতে শুধু কাজ করে যান সাধারণ মানুষের কল্যাণে। আমি এমনই একজন সাহসী, নির্লোভ, বড় আত্মার এক মহান নেতার কিছু কাজকর্মের স্মৃতিচারণ করতে যাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলরেই প্রিয় ইয়াহিয়া ভাই। তিনি বৈশ্বিক মহামারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন গত ২২শে আগস্ট ২০২০ সকালে (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

তার সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৭ সালে যখন তিনি প্রশিকা (মানবিক সাহায্য সংস্থা) কুমিল্লা অঞ্চলে 'লাঙ্গলধর' নামক একটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রকল্প এলাকাটি ছিল বি.বাড়িয়া জেলার সরাইল, নাসিরনগর ও কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম উপজেলা নিয়ে। এর প্রধান কার্যালয় ছিল সরাইল থানার অরুয়াইলে। মিজানুর রহমান চারু ভাই এর ইনচার্জ ছিলেন, আমি ছিলাম তার সহযোগী সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। 'লাঙ্গলধর' প্রকল্পের মূল কাজ ছিল ভূমিহীন, দরিদ্র, শোষিত, সম্পদহীন দেশের প্রায় ৮০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন 'ভূমিহীন সমিতি' তৈরি করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার দাবি, ন্যায্য মজুরি আদায়, খাস জমির অধিকার, সুদি মহাজন ও দাদন ব্যবসায়িদের হাত থেকে গরিবদের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। গ্রামে গ্রামে 'ভূমিহীন সমিতি' গঠন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্ব সৃষ্টি, বৃহত্তর নেটওয়ার্ক গড়া, সঞ্চয় করা ও একতা বৃদ্ধির জন্য রাতের বেলায় নিয়মিত সভা-সমাবেশ করা। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত, তাদের এ কাজ আমার দৃষ্টিতে এলো। এর বিরোধিতা শুরু করলাম কারণ কাজের ধরনে একটি রাজনীতির গন্ধ পেয়েছিলাম। 'লাঙ্গলধর' একদিকে সংগঠন গড়তো, আমি তার বিরোধিতা করে তা ভেঙ্গে দিতাম। বিষয়টি ইয়াহিয়া ভাইয়ের নজরে পড়লে তিনি ও চারু ভাই আমার সাথে বসলেন, আমাকে বোঝালেন। ইয়াহিয়া ভাইয়ের যুক্তির কাছে হেরে গেলাম। তখনও আমার জীবনের লক্ষ্য বহু ধারায় বিভক্ত, কি করবো তা অনিশ্চিত। গভীর সমুদ্রে একজন নাবিক যখন তার গন্তব্যে পৌঁছার নিশানা হারিয়ে ফেলে তখন আকাশে মিটমিটিয়ে জ্বলে যে ধ্রুবতারা, সেই হয় গন্তব্যে পৌঁছার একমাত্র ভরসা। তিনি আমার জীবনে অন্যতম ধ্রুবতারা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তিনি আমাকে সমাজ পরিবর্তনের সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তার সহকর্মী হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দিলেন। সেই থেকে একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে প্রায় চার যুগেরও অধিক সময় অতিক্রম করলাম। আমার AIM IN LIFE কী হবে তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন আমার পথ প্রদর্শক হয়ে। তারপর থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার ও নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছে।

আমি ছিলাম তার পরিবারের অংশ, আমার স্ত্রী লুৎফা বেগমকে তিনি ছোট বোনের মতো দেখতেন। ব্যক্তিগতভাবে উনি ছিলেন আমার পরিবারের একজন অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার মেন্টর। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে অনেকভাবে ঋণী যা কখনো শোধ করার মতো নয়। যেমন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্য ৩ মাস স্ব-বেতনে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। অফিসে অনেকেই পরীক্ষা না দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই বলে যে, গতানুগতিক সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে? ইয়াহিয়া ভাই তার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে পরীক্ষা দিতেই হবে এবং ভালভাবে পাশ করতে হবে। আমার বিয়ের সব ছবি তার হাত দিয়ে তোলা। বিয়ের পর হানিমুন করেছিলাম তারই কুমিল্লার বাসায়। ঢাকায় বিয়ের সময়ে অফিসের গেস্ট হাউজে থাকার সু-ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। জীবনে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, উপস্থাপন, রিপোর্ট রাইটিং, প্রেজেন্টেশান স্টাইল ইত্যাদির জন্য তাকে অনুসরণ করতাম। তাকেই আমি অন্যতম আইকন হিসেবে মানতাম। ব্যক্তি হিসেবে উনি উদার-মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। উনার মতো সহজ-সরল, অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত রুচিবোধ, আত্মসম্মান জ্ঞান, প্রচার বিমুখ, কাজ পাগল, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, বিবেকবান, ধৈর্যশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। এজন্যই উনি ছিলেন আমার আইডল, পথ প্রদর্শক, ভাল কাজের অন্যতম সমর্থক ও অনুপ্রেরণার উৎস। এক কথায় ইয়াহিয়া ভাই ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী একজন সম্পূর্ণ মানুষ। যার তুলনা তিনি নিজেই। নীরবে নিভৃতে কাজ করা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজে হেরে গিয়ে অন্যকে জিতিয়ে দিতেন, তবু বিরোধে যেতেন না। চরম ধৈর্যশীলতা ছিল তার অন্যতম গুণ।

সারধারণত দুটো যোগ্যতা ও গুণ মানুষের সমানভাবে কাজ করে না, তার একটি হলো একাডেমিসিয়ান ও অপরটি

মাঠের মানুষ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (ছবিতে সামনে) এবং সিদীপ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ

নাসিরনগর ও সরাইলের বেমালিয়া নদী খননের জন্য প্রায় ১,৮০০ মণ গম বরাদ্দ হয়েছিল। লেবারদের না দিয়ে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মী ১৯৮১ সালে সে গম আত্মসাৎ করে। তার প্রতিবাদে প্রায় পনের হাজারের অধিক শ্রমিক নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও'র অফিস ঘেরাও করা হয়। এই কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন একজন সংগঠক, চারু ভাই ছিলেন মূল নেতৃত্বে। সেই সফল প্রতিবাদ কর্মসূচির কারণে শ্রমিকদের সব পাওনা আদায় করা সম্ভব হয়েছিল।

প্র্যাকটিশনার। তবে ইয়াহিয়া ভাই এক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনি দুটো গুণই সমান্তরালভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। তিনি অসংখ্য গবেষণার কাজও করেছেন।

অনেক সভা ও সমন্বয় সভাগুলোতে উনি নীরব চুপচাপ থাকতেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন। সারাদিনের আলোচনা শেষে আমরা যখন এর উপসংহার টেনে সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতাম তখন তিনি তার মূল্যায়ন ও মতামত উপস্থাপন করতেন। উনার মতামত আসার পর আমরা সকলে সারাদিন বসে যা স্থির করে ফেলতাম, সেটা আবার নতুন করে শুরু করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হতো। এটাই ছিল ইয়াহিয়া ভাইয়ের সৃজনশীলতা ও ক্যারিশমা, যেক্ষেত্রে অন্য দশজনের থেকে তিনি ছিলেন একেবারেই আলাদা। তিনি যেখানে যখন গেছেন সেখানেই সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি কাজ করেছেন প্রশিকায়, জাতিসংঘের ভলান্টিয়ারে (UNV), গ্রামীণ ট্রাস্টে, সিডিএফের নির্বাহী হয়ে, আশা'র সাধারণ পরিষদের সদস্য হয়ে, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে এবং সবশেষে নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠান সিদীপে।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তান সরকার এসএসসি পরীক্ষার আয়োজন করলো। স্বাধীনতার পক্ষের লোকেরা ডাক দিলেন পরীক্ষা বর্জনের। এ সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরীক্ষাকেন্দ্রে পাকিস্তানের সমর্থক গোষ্ঠীর পক্ষের হাতেগোনা কিছু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিলো। দিনে দুপুরে পরীক্ষা বানচালের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করা হলো। ব্যাস! পরীক্ষা বাতিল কিন্তু পাকসেনারা অন্নদা হাইস্কুল সংলগ্ন বাড়ি থেকে ইয়াহিয়া ভাইকে ধরে আনলো। প্রায় ২০ দিন পাকসেনাদের ক্যাম্পে তাকে নির্যাতন করা হলো। পা ঘরের ছাদে বেঁধে মাথা নিচে রেখে প্রতিদিন পালা করে তারা তাকে অত্যাচার করতো। অবশেষে আজিজুল হক স্যারের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি ছাড়া পেলেন। এ নিয়ে কোন দিন তিনি কাউকে কিছু বলে কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তারও ত্যাগ ছিল, একথা কোনদিন মুখে আনেননি।

এ সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরীক্ষাকেন্দ্রে পাকিস্তানের সমর্থক গোষ্ঠীর পক্ষের হাতেগোনা কিছু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিলো। দিনে দুপুরে পরীক্ষা বানচালের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করা হলো। ব্যাস! পরীক্ষা বাতিল কিন্তু পাকসেনারা অন্নদা হাইস্কুল সংলগ্ন বাড়ি থেকে ইয়াহিয়া ভাইকে ধরে আনলো।

অসম্ভব সাহস ও ধৈর্য নিয়ে তিনি চলতেন। বুকে পেসমেকার যন্ত্রের যন্ত্রণা ও ছোট ছেলের অটিজমের বেদনা নিয়েও এগিয়ে গেছেন অবিরত, থেমে থাকেননি। তিনি সামাজিক উন্নয়ন ও আর্থিক উন্নয়ন দুয়ের সংমিশ্রণের এক অন্যতম সফল কারিগর ছিলেন। তার সৃজনশীল কাজের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। নাসিরনগর ও সরাইলের বেমালিয়া নদী খননের জন্য প্রায় ১,৮০০ মণ গম বরাদ্দ হয়েছিল। লেবারদের না দিয়ে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক কর্মী ১৯৮১ সালে সে গম আত্মসাৎ করে। তার প্রতিবাদে প্রায় পনের হাজারের অধিক শ্রমিক নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও'র অফিস ঘেরাও করা হয়। এই কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন একজন সংগঠক, চারু ভাই ছিলেন মূল নেতৃত্বে। সেই সফল প্রতিবাদ কর্মসূচির কারণে শ্রমিকদের সব পাওনা আদায় করা সম্ভব হয়েছিল।

নাসির নগরের কিলো মিয়ার মার্ডারের বিচার প্রাপ্তির জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তি সরুল্লা হাজীকে বিচারের আওতায় আনার জন্য প্রবল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। এর সফলতা দেখতে ড. আনু মাহমুদ সরেজমিনে চলে গিয়েছিলেন। জয়ধর গ্রামে প্রায় দশ হাজার ভূমিহীন নিয়ে ভূমি শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্তির দাবিতে মহা-সমাবেশে উনি ছিলেন একজন উদ্যোক্তা, সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. আনু মাহমুদ। পানিশ্বর শাহবাজপুরের তিতাস ও মেঘনা নদীর সংযোগ খালের পাড়ে বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে প্রায় দশ হাজার একর জমিতে ইরিগেশন; আজবপুর, রসুলপুর খালে পাম্প বসিয়ে পাঁচ হাজার একর জমিতে উন্নত চাষাবাদ; কুমিল্লায় ভারতের ত্রিপুরা থেকে আসা পানি গোমতি নদী গড়িয়ে মেঘনায় পড়ে, তাতে বাঁধ দিয়ে হাজার হাজার একর জমিতে ইরিগেশন; জয়কান্দিতে শ্রমিকদের মালিকানায় 'লাঙ্গলধর' নামের ব্রিক ফিল্ড স্থাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন, শ্রমিকদের মালিকানায় ও নেতৃত্বে কোন কারখানা সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। উন্নতমানের সব্জি চাষ, বৃক্ষরোপণ অভিযান (বিশেষ করে রেইন্ডি কড়ই, মেহগনি, নারিকেল), পেয়ারার চাষ, কলের লাঙ্গলের চাষবাস, কম্পোস্ট সার–এগুলো নিজ উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১৯৮১-৮২'র দিকে কুমিল্লা প্রশিকা নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে। নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত–সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, বিপ্লব, না অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ সময় ইয়াহিয়া ভাই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরলেন এবং খুবই সফলতার সাথে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লা প্রশিকাকে দাঁড় করালেন। যখনই প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাঁড়াল, তখনই পূর্বের ব্যর্থ নেতারা আবার তার নেতৃত্বকে খর্ব করার চেষ্টা করলেন। নীরবে নিভৃতে কুমিল্লা প্রশিকা ছেড়ে জাতিসংঘের ভলান্টিয়ারের চাকুরি নিয়ে আফ্রিকায় চলে গেলেন। আমরা এখনো বিশ্বাস করি যে, ইয়াহিয়া ভাই কুমিল্লা প্রশিকায় থাকলে, কুমিল্লা প্রশিকা এভাবে ধ্বংস হতো না।

তিনি দেশে ফিরে এসে গ্রামীণ ট্রাস্টে যোগদান করলেন। সেখানে অনেক নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আইডিয়া নিয়ে সফলভাবে কাজ শুরু করলেন। যার কাজের প্রশংসায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, Yahiya is a man of Many Qualities। ছাত্রজীবনেই বাম ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে অতি দরিদ্র শ্রমজীবী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের অধিকার, ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজের জীবনের বৃহৎ সময় কাটিয়েছেন দেশে এবং বিদেশে। গ্রামীণ ট্রাস্টের চুক্তি শেষ হলে তা নবায়ন না করে যোগ দিলেন সিডিএফের প্রথম নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে। সেখানেও চমৎকারভাবে তার নেতৃত্বে প্রায় হাজারো এনজিওর নেটওয়ার্কে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হলেন। তারপর যোগ দিলেন পল্লী বিকাশ কেন্দ্রে (PBK), যেখানে শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ড হতো। তিনি আর্থিক কার্যক্রম চালু করার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে মঠকলায় (কিশোরগঞ্জ) নিয়ে গেলেন। ৫ দিন প্রায় ২০-২৫ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু করলেন PBK-এর সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি, সেটিও অত্যন্ত সফল হলো।

সবশেষে 'সিদীপ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান নিজেই দাঁড় করালেন ১৯৯৫ সালে। গোলাম সারোয়ার ও স্বরজিৎ রায় দুজন কর্মী (দুজনই আমার খুবই পরিচিত) দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কুটি ও ধরখার নামক স্থানে প্রথম শাখা খোলেন। শুধুমাত্র সঞ্চয় ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে কাজটা শুরু করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদেশি কোন টাকা তিনি নিবেন না। তাই আশা'র সহযোগিতা চাইলেন। সিদীপকে আশার পার্টনারশিপের আওতায় এনে আশার মডেল, দক্ষ জনবল (তার মধ্যে আমিনুল ইসলাম অন্যতম) ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে এর সফল যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম ঋণ বিতরণ উদ্বোধনের জন্য আশা'র প্রেসিডেন্ট সফিকুল হক চৌধুরী ও আমি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। সেই থেকে তার শুভযাত্রা শুরু হলো। এখন সিদীপ জাতীয় পর্যায়ের একটি অন্যতম মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য আশা'র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও পছন্দ করতেন। প্রায়শ দুজনে একান্ত মিটিংয়ে উন্নয়নের নানা কর্মসূচি, এর ভবিষ্যৎ কৌশল ও ঝুঁকি নিয়ে মতের আদান-প্রদান করতেন। তার মতামতের যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন আশা'র প্রেসিডেন্ট মহোদয়। আশা'র প্রেসিডেন্ট মহোদয় তার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মডেল দাঁড় করিয়েছে যা অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং অভিনব এ পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফলাফল অর্জনে ও ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত সফল যা আশাসহ সারা দেশের অনেক এনজিও বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলায় গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহের আরেকটি মডেল ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে।

মানুষ মরণশীল, মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে একদিন গ্রহণ করতে হবে। ইয়াহিয়া ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠান ও তার সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। আসুন আমরা তার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান সিদীপের সফলতার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়।

লেখক: সিওও, আশা ইন্টারন্যাশনাল

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া: জীবন ও কর্ম

সালেহা বেগম

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে প্রায় সব মানুষই যার যার নিজের মত করে জীবনকে সাজিয়ে নিয়ে থাকে। কেউ স্বপ্নের মত করে তা গড়ে তুলতে পারে, কেউ ঠিক অতটা গুছিয়ে উঠতে পারে না। ইয়াহিয়া ছিলেন প্রথম দলে। তিনি তাঁর দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও একনিষ্ঠতা দিয়ে নিজের লালিত স্বপ্নগুলোকে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন। তার স্বপ্ন ছিল মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া। যাতে এই সহায়তার মাধ্যমে তারা নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথ খুঁজে বের করতে পারে। অর্থাৎ তাদের আত্মনির্ভর করে তোলা।

আজ তাঁর সম্পর্কে লিখতে বসে মনটা বিষণ্নতায় ভরে উঠলো, মনে আসছে সদা হাস্যোজ্জ্বল এই মুখটি আমরা আর কেউই কখনও দেখতে পাবো না। করোনার নির্মমতার শিকার হয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এই সেদিন ২২শে আগস্ট।

ইয়াহিয়া ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক সজ্জন ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন অল্প বয়সেই। বন্ধুদের নিয়ে বোমা তৈরির অভিযোগে তিনি আটক হয়েছিলেন পাকিস্তানি সৈনিকদের হাতে, নির্যাতিত হয়েছিলেন ওদের দ্বারা। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনি সবসময় বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও নিজ প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। একটি অনুসন্ধিৎসু মন সদা সজাগ, চারপাশে যা ঘটছে তা জানার আগ্রহ ছিলো প্রচণ্ড রকম। প্রতিনিয়ত তিনি চোখে দেখা বিষয়ের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নতুন পথের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। তাঁর সাথে নানা আলাপের সূত্রে জেনেছি যখন ষাট দশকের শুরুর দিকে তাঁর বড় ভাই ফজলুল বারি বার্ডে যোগদান করেন তখন ইয়াহিয়া মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন বড় ভাইয়ের কাছে। সে সময় অসাধারণ প্রতিভাধর কর্ম-তৎপর ড. আখতার হামিদ খান বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে তৎকালীন কুমিল্লায় গ্রামের নিপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। ড. খান তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য বেশ কজন উদ্যোগী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা তরুণদের নিয়োগ দেন। তাদের মধ্যে ফজলুল বারি ছিলেন একজন। সে সময় থেকে গ্রামে বসবাসরত মানুষের দুর্দশা এবং তাদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণী ধারণা পান ইয়াহিয়া। সেটা হয়ত তাঁর মনে কিছু রেখাপাত করে থাকতে পারে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কুমিল্লাস্থ বার্ড-এ (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী) একটি

গ্রাম-সার্ভের কাজে অংশ নেন। বার্ডের সার্ভে শেষ করার পর তিনি কুমিল্লা প্রশিকাতে যোগদান করেন। আশির দশকের শুরুর দিকে তিনি United Nations Development (UNDP)-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি কাজ নিয়ে আফ্রিকায় চলে যান। আফ্রিকা থেকে জেনেভাতে যান UNDPর কাজেই। সাত/আট বছর কাজ করে তিনি ইন্দোনেশিয়া যান World Bank-এর একটি প্রোগ্রামে এবং বছর দুই ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেন। নব্বই দশকের শুরুতে দেশে ফিরে আসেন। আবারও গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণমূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বেশ কিছুটা সময় গ্রামীণ ট্রাস্টের সাথে কাজ করেন। তিনি CDF-এর প্রথম নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, দেশ ও দেশের ছিন্নমূল মানুষের দুঃখকষ্ট তাঁকে সবসময় দারুণ ব্যাথিত করেছে। তাই এ দেশে যে কজন প্রথিতযশা ব্যক্তি গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নিপীড়ন নিরসনে কাজ করেছেন এবং সফলতা পেয়েছেন তিনি তাদের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সরাসরি গ্রামে গিয়ে কাজ করে। অর্জিত সেই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ১৯৯৫ সালে একঝাঁক আত্ম-প্রত্যয়ী কাজ-পাগল তরুণকে সাথে করে তিনি সিদীপ (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন এবং নিজের কাজের লক্ষ্য ও কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করেন। শুরুতেই তিনি স্থির করেন, কোন অনুদান ও বিদেশি সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন কাজ পরিচালনায় না গিয়ে, নিজস্ব শক্তি-সার্মথ্য নিয়ে ছোট আকারে কাজ শুরু করবেন এবং ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীল একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন।

তিনি উন্নয়নের মৌলিক ধারণাটি সঠিকভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করে কাজে হাত দেন। গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র বাস্তবায়নে ব্রতী হন তিনি। তাঁর ধারণাটি ছিল যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের সমস্যা অনুধাবনে সহায়তা করা এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্ণয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। যাতে এই কাজকে তারা নিজেদের জীবনযাপনের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে ভাবতে পারে

তিনি উন্নয়নের মৌলিক ধারণাটি সঠিকভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করে কাজে হাত দেন। গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র বাস্তবায়নে ব্রতী হন তিনি। তাঁর ধারণাটি ছিল যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের সমস্যা অনুধাবনে সহায়তা করা এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্ণয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। যাতে এই কাজকে তারা নিজেদের জীবনযাপনের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে ভাবতে পারে। তাঁর কাজের গতিপ্রকৃতিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জনকল্যাণমুখী কাজের সাথে তাঁর মনের সামঞ্জস্যতা ছিল। এটিই ছিল তাঁর সফলতার মূল চালিকাশক্তি।

সিদীপের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ঋণকর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা, বয়স্কদের সম্মান দেয়া, নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন ইত্যাদি। সিদীপের কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গ্রামীণ জনগণের সামগ্রিক উন্নয়ন। সিদীপ উদ্ভাবিত 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' বর্তমানে পিকেএসএফের (পল্লী কর্মী সহায়ক ফাউণ্ডেশন) উদ্যোগে বেশ কয়েকটি এনজিও বাস্তবায়ন করছে। এটি সিদীপের একটি বড় সফলতা।

ইয়াহিয়ার চলাফেরা ছিল একেবারেই সাদাসিধে। হাসিতে প্রাণবন্ত চেহারা দেখে মনে হয় নাই কোন কিছু নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। কিন্তু শেষ বিবেচনায় দেখা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুছিয়ে চলা মানুষ। কোন কাজ করার আগে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েই করতেন। তাঁর মধ্যে এই দূরদর্শিতা ও সচেতনতা সম্পূর্ণভাবে ছিল।

ইয়াহিয়ার একটি অতুলনীয় গুণ ছিল ধৈর্যশীলতা। একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে নানা বিচিত্র ধরনের লোকের সাথে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়, তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে তা করেছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনে এমন মনোভাব সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে তারা প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের বলে মনে করে নিয়েছেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠনের সাথে একাত্ম হয়ে আছেন। তাঁর সামগ্রিক ভাবনা ও চেতনায় করণীয় বিষয়গুলোকে তিনি যেন এক নিপুণ শিল্পীর মত করে চিত্রিত করে রেখেছেন, প্রয়োজনে সেসব বাস্তবায়ন করে গেছেন। সব শেষে বলবো যে, দুটো গুণ সবাইকে ছাড়িয়ে একটি ভিন্নতর উচ্চতায় নিয়ে গেছে তাঁকে; তা হলো গভীর মননশীলতা ও কর্মই ধর্ম নীতি।

ইয়াহিয়া প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ কর্মপ্রবাহ রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। চলুন আমরা তাঁর স্বপ্নকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে কাজ করি।

একজন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার পোষাক কারখানায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

A son of the soil

Mizanur Rahman

Centre for Development Innovation and Practices (CDIP) is a mid-size microfinance NGO, established in 1995 in a remote village with a personal donation of the founder, Muhammad Yahiya. Currently, CDIP has 200 thousand (2 lac) borrowers across 18 districts in Bangladesh. Among others, CDIP has been known for their extraordinary and innovative education initiative for elementary school-going children from extremely poor households in rural areas.

Muhammad Yahiya's idea behind the education programme was to reduce the then rampant elementary school drop-out, especially from the extremely poor households. One of the key reasons of drop-out was not-doing homework by children, leading to unsuccessful annual examination. The major reason of not-doing homework is the lack of assistance received from parents or tutors typically available in affluent families in which parents have at

Muhammad Yahiya's idea behind the education programme was to reduce the then rampant elementary school drop-out, especially from the extremely poor households. One of the key reasons of drop-out was not-doing homework by children, leading to unsuccessful annual examination. The major reason of not-doing homework is the lack of assistance received from parents or tutors typically available in affluent families in which parents have at least some education or hire tutors.

least some education or hire tutors. In the disadvantaged families, parents are unlettered and thus cannot provide help in homework and thus children attend classes without any preparation and cannot perform in the classes. This has at least two consequences -- in-class humiliation due to underperformance and grade failure in periodical and final examinations. In this situation, the easy thing for children is to drop from school. The drop-out rate at the primary school level is very high, at over 20 per cent. This has been a major concern of the nation's laudable flagship development programme.

CDIP introduced their after-school programme organised and taught by village women with secondary education. Currently, there are over 2,500 such women for about 60,000 primary-school children. Rigorous research undertaken by notable academics and researchers shows that children participating in CDIP's after-school programme experienced significantly lower primary school discontinuation than those children attending otherwise-comparable schools in control villages. Subsequently, the CDIP after-school programme has been adopted by ASA, a mega microfinance and development NGO in Bangladesh as well as by some other NGOs. This initiative of after-school programme can help millions of disadvantaged children enhance their school performance and thus graduate to the next level of schooling in Bangladesh and similar countries.

Muhammad Yahiya was one of the pioneers who devoted himself to innovations of alleviating poverty in the mid-1970s when the nation was undergoing serious resource scarcities, hunger, and poverty. A 1969-student movement organiser, a progressive thinker, and a Liberation War torture-cell survivor, he after his graduation from Dhaka University in 1974 went to a village where Cumilla BARD does research on village development. He resided there and tried to learn how group formation for

Muhammad Yahiya was one of the pioneers who devoted himself to innovations of alleviating poverty in the mid-1970s when the nation was undergoing serious resource scarcities, hunger, and poverty

income generation works. Then, he was one of the members of senior leadership team who founded PROSHIKA based in Cumilla. But in the early 1980s he decided to move to Zambia and joined UNDP as a resident adviser to help in rural development. He then came back to Dhaka in an international position at UNDP. In a few months he switched his job to the World Bank in Indonesia as a development adviser. With an invitation from Professor Yunus, he returned home and joined Grameen Bank as General Manager in the early 1990s but left Grameen Bank and started his own CDIP in 1995. Muhammad Yahiya was determined to develop homegrown programmes without external help, especially foreign donation, and he showed it is very much possible.

In his lifetime Muhammad Yahiya could see the shining Bangladesh in terms of social and economic development and significantly contributed to that development journey. A gifted, talented and charismatic son of the soil, Yahiya will be remembered by the hundreds and thousands of CDIP participants and families forever.

Mizanur Rahman, PhD is Senior Research Adviser, MEASURE Evaluation, University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Location: icddr,b, Dhaka, Bangladesh

(ইংরেজি দা ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় ২৮ আগস্ট ২০২০ প্রকাশিত। এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।)

গ্রামে শিশুশিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মানব-উন্নয়নে নিবেদিত ছিলো যে প্রাণ

আলমগীর খান

কভিড-১৯ কেড়ে নিলো আরও একটি মূল্যবান প্রাণ। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ঢাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় গত ২২ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন দেশের উন্নয়নক্ষেত্রে আপন কর্ম-গৌরবে ভাস্বর এক ব্যক্তিত্ব। চিন্তাশীল সমাজকর্মীদের মাঝে ছিলেন অগ্রগণ্যদের একজন। স্বাধীনতা-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তিনি এ দেশের সেইসব পথিকৃৎদের সারিতে যারা দান-অনুদান, ত্রাণ, বিদেশি সাহায্য, নির্দেশিত উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির ওপর আস্থা হারিয়ে নতুন পথের সন্ধান করে সাহসের সাথে এগিয়ে যান। অগ্রগণ্য পথিকৃৎদের অনুসরণে তিনিও বুঝতে পারেন যে, গ্রামপ্রধান এ দেশের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটির বিচ্ছিন্ন সমাধান নেই, তা বহুমুখী সার্বিক জীবনের অংশ।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার মৌল চিন্তাটি ছিলো আত্মনির্ভরতা। শুরুতেই তিনি বুঝতে পারেন অনুদান, ত্রাণ, বিদেশি সাহায্য ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদে মানুষের উন্নতিকে সাহায্য করে না, বরং প্রকারান্তরে তাকে আরও পরনির্ভর করে তোলে। ফলে ঐসব ক্ষণস্থায়ী উদ্যোগ মানুষকে একসময় আরও শোষণ ও দমনের শিকার করে তোলে। উন্নয়ন প্রচেষ্টা বলতে তিনি বুঝতেন পিছিয়ে পড়া মানুষের শক্তিকে একত্র করা ও তাদের নিজ পায়ে দাঁড়ানো। এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে গ্রামের দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ মানুষের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে টেনে আনে। তবে কেবল ক্ষুদ্রঋণের ক্ষুদ্র ঘেরাটোপে আটকে ছিলো না তার ব্যতিক্রমী ভাবনা। ক্ষুদ্রঋণকে তিনি সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটামাত্র অংশ মনে করেছেন।

নিজের উন্নয়ন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পরপরই তিনি গ্রামের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তার কথা ভাবেন। ভাবেন তারা স্কুলে ভর্তি হলেও বড় একটা অংশ দিনেদিনে ঝরে পড়তে থাকে কেন। এরকম কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন বাড়িতে নিরক্ষর বা কর্মব্যস্ত বাবা-মা তাদেরকে পড়ালেখায় কোনো সহযোগিতা করতে পারেন না। অথচ প্রাথমিক স্কুলেও নানা ধরনের সংকট। ভাবেন, যদি স্কুলের পর বাড়িতে কেউ তাদের স্কুলের পড়াটা তৈরি করে দেয়, শিখিয়ে দেয়, এসব শিশুও পিছিয়ে থাকবে না, তারাও ক্লাসে ও পরীক্ষায় ভাল করবে। সেজন্য গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ও গৃহবধূর সঙ্গে কথা বললেন। তাদের উৎসাহে ২০০৫এ চালু করেন তার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি যার আওতায় গ্রামেরই উন্মুক্ত উঠানে বা বাগানে একজন স্থানীয় শিক্ষিত মেয়ে কিছু প্রাক-প্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণির ছেলেমেয়েকে স্কুলের পড়া তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব নেন। এভাবে এখন ১৯টি জেলায় সংস্থার সব কর্ম-এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গ্রামের শিশু এ সহযোগিতা পেয়ে

পড়ালেখায় ভালো করছে। বর্তমানে এ কর্মসূচির সঙ্গে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকৃতি পাঠ, প্রবীণ সংবর্ধনা ইত্যাদি অনেক কিছু যুক্ত হয়ে একে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়ের স্কুলের পড়া তৈরি করে দেয়ার এ মডেলটি পরবর্তীতে দেশের অনেক এনজিও অনুসরণ করে ও তাদের মতো করে আরও বিস্তৃতভাবে এ ধরনের কর্মসূচি চালু করে। সব মিলিয়ে এখন বহু গ্রামে কোনো বেসরকারি সংস্থার পরিচালনায় এরকম শিক্ষাকেন্দ্রে সারা দেশের বহু শিশু পড়ালেখায় সহায়তা পাচ্ছে যা প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়া কমিয়ে আনতে ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও নানামুখী প্রচেষ্টার ফলে একসময়কার পিছিয়ে পড়া শিশুরাও এখন সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীল মেধা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে। ২০১৫ সালে এই উদ্ভাবনী চিন্তা ও কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তার সংস্থা 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা' হিসেবে ১০ম Citi ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা পুরস্কার লাভ করে।

গ্রামের দরিদ্র কর্মজীবী মানুষের দোরগোড়ায় কীভাবে স্বল্পমুল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া যায় তা নিয়ে তিনি অনেক দিন ধরে ভাবছিলেন। এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তারদের সহায়তায় একটি স্বাস্থ্যকর্মসূচি তার সংস্থায় চালু হলো। কিন্তু তা সফল হলো না। এরপর তিনি SACMO অর্থাৎ উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তাদেরকে পূর্ণ নিয়োগ দিয়ে নতুন করে এ কর্মসূচি চালু করলেন। যা সাফল্য লাভ করে ও গ্রামপর্যায়ে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে সংস্থার প্রায় সব কর্ম-এলাকায় এ কর্মসূচি চালু যা থেকে কর্মজীবী পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষ-শিশু তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ পাচ্ছে।

কয়েক বছর আগে তিনি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের নাচগান ইত্যাদি শেখার ও চর্চার জন্য ঢাকায় একটি স্কুল শুরু করেছিলেন যা অবশ্য পরে নানা কারণে বন্ধ করে দিতে হয়। প্রান্তিক কর্মজীবী মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সেসবের সমাধান নিয়ে তিনি ভাবতেন। এবং একজন কর্মবীর হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তার কিছু সমাধানে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গ্রামের বার্ধক্যে উপনীত মানুষ যাতে স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক আনন্দ লাভ করে বেঁচে থাকে ও কারো অবহেলার শিকার না হয় সেজন্য তিনি একটি ভিন্নধর্মী উদ্যোগের চিন্তা করছিলেন। যাতে আমাদের গ্রামজীবনে প্রবীণ-প্রবীণার প্রতি সম্মান দেখানোর প্রচলিত রীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমী সংগঠিত চেষ্টার একটা মেলবন্ধন করে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। পোষাকশিল্পের নারী শ্রমিকরা যাতে স্বল্পমূল্যে দুপুরের ও রাতের খাবার কিনে খেতে পারে সেকথা ভেবেছিলেন অনেক দিন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার একটি শিশুর মতো মন ছিলো, শিশুদেরকে তিনি ভালবাসতেন ও তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যেতে পারতেন। তার ছিলো অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও বই পড়ার ইচ্ছা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও পথের সন্ধান করতেন। শিল্পসাহিত্যের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর অনুরাগী, আবার দেশে বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী। তবে প্রায় সব কাজই তিনি করতে চাইতেন নীরবে, ঢাকঢোল না বাজিয়ে। নিজেক সহজে সামনে তুলে ধরতে চাইতেন না, আর সে কারণেই জনসমাজে তিনি তার সতীর্থদের চেয়ে অনেক কম পরিচিত।

তরুণ বয়সে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে বোমা তৈরির অভিযোগে পাকিস্তানিসেনা কর্তৃক আটক হন এবং বন্দী অবস্থায় অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। এসব কথার কিছু আগামী-প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর-উপন্যাস 'একাত্তরের হজমওয়ালা' বইতে চিত্রিত করেছেন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ।

ছিলেন একজন ভালো লেখক। ঘোরপ্যাঁচ না করে সরলভাবে সহজ ভাষায় তিনি লেখায় তার মনের কথা প্রকাশ করতেন। শিশুদের জন্য 'মহাকাশে মহাজয়' শীর্ষক একটা বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী লিখেছেন। 'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি' তার একটি কবিতার বই। শিক্ষা বিষয়ে আমার সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত তার দুটি সংকলন-গ্রন্থ হচ্ছে: 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' ও 'আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে'। পরিকল্পনা ছিলো তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও কিছু সৃজনশীল কাজের।

হাসিঠাট্টার এক সহজাত ক্ষমতায় ঋদ্ধ ছিলেন তিনি। সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মেরে এবং মানুষের সঙ্গে মিশে থেকে সময় কাটাতে চাইতেন। সে কারণে তার সংস্থার কার্যালয়ে প্রায়ই বিভিন্নরকম গান-কবিতা-কৌতুক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ, ঈদ এরকম নানা উপলক্ষে। আমি যখন সংস্থার শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে' যারা লেখেন ও নানাভাবে যেসব লেখক-শিল্পী এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে নিয়ে একটা আড্ডা আয়োজনের প্রস্তাব দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন। তার উৎসাহ ও উদার সহযোগিতার ফলেই আমার পক্ষে এ পর্যন্ত ৩টি 'শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন' আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। যেখানে কথা, গান, আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদিসহ দিনভর আড্ডায় মেতে উঠেছেন ঢাকার বিভিন্ন লেখক, শিল্পী ও বিদগ্ধজন। তাদের চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েছি আমরাও।

আগামী লেখক-শিল্পী সম্মিলনে তাদের অনেকের চোখ হয়তো মাঝেমাঝে ভিজে যাবে তার বন্ধুত্বময় প্রাণবন্ত উপস্থিতির অভাবে। তারপরও তিনি সবসময় আমাদের মনের মাঝেই থাকবেন। আর আমি কোনো নতুন চিন্তায় আলোড়িত হলে ও নতুন কিছু শুরুর কথা ভাবলে চারপাশের বাধাসমূহ উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার মূল্যবান প্রেরণা পাবো তার কাছ থেকে যেখানেই থাকুন তিনি। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আর নেই, সত্য। কিন্তু আছে তার কাজ, উদার হাসি, আনন্দময় চোখ, সহানুভূতিময় কণ্ঠ ও নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান। সামাজিক ও মানব উন্নয়নের পথে তিনি সবসময় হয়ে থাকবেন প্রেরণার উৎস।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

একজন উন্নয়ন পথিকৃৎ

মনজুর শামস

কী বলা যায় তাকে? দেশে প্রথম গ্রামের অসহায় নারীদের শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরিকারী? –হ্যাঁ। নিবেদিতপ্রাণ একজন উন্নয়ন কর্মী? –হ্যাঁ। মানবীয় গুণে ঋদ্ধ একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ? –হ্যাঁ। একজন সচেতন অভিভাবক? –হ্যাঁ। দেশ আর দেশের মানুষের কল্যাণচিন্তায় উন্নয়নের নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করায় ব্রতী সমাজ হিতৈষী? –হ্যাঁ। শিশুশিক্ষায় উদ্ভাবনী পথিকৃৎ? –হ্যাঁ। একজন বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক? –হ্যাঁ। একজন কবি ও কাব্যরসিক? –হ্যাঁ। বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য-যত্নশীল স্বামী? –হ্যাঁ। দায়িত্বশীল পিতা? –হ্যাঁ। নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের সদাহিতাকাঙ্ক্ষী? –হ্যাঁ। না, তাকে এই ধরনের শত বিশেষণের ফ্রেমে আটকে রাখা যাবে না। তিনি বেশি কিছু। যে বিশেষণই আরোপ করা হোক না কেন, মনে হবে মহত্ত্বের অনেক রশ্মিই বুঝি ঠিকমতো ফেলা হলো না তার ঋজু মানস অবয়বে। নিজের উদ্ভাবিত গ্রামের কোনো শিক্ষাকেন্দ্র দেখতে গেলে কক্ষনো এনে দেয়া চেয়ারে বসতেন না। উঠোনে শিশুদের মাঝে বসে নিজেও হয়ে যেতেন শিশু শিক্ষার্থী। অফিসে হঠাৎ করে সব ফ্লোরে ঘোষণা করা হলো– অতোটার সময় সবাইকে সম্মেলনকক্ষে যেতে হবে। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? বুকের ভেতর চরম কৌতূহল নিয়ে সমবেত হয়ে সবাই তো অবাক! কবিতা-গল্প-কৌতুকের আসর। সবার কণ্ঠে সেসব শুনতে চাইতেন তিনি। ড্রাইভার-রাঁধুনি-অফিস সহকারীরাও বাদ যেত না। শেষে নিজেই তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন রবি ঠাকুরের কবিতা, কিংবা তার নিজের। নিমেষেই কর্মক্লান্তি দূর হয়ে যেত। মনের ভেতর দখিনা বাতাসের পাল তুলে কাজে ফিরে যেত সবাই।

ছোটবেলায় পারিবারিক পরিমণ্ডলেই সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, এবং সেই তরুণ বয়সে সহপাঠীদের সঙ্গে বোমা তৈরি করতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনির হাতে ধরা পড়ে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন, তাকে মেরেই ফেলা হতো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁচে যান। সেই মানসিক যন্ত্রণার রেশ তাকে বহুকাল বয়ে বেড়াতে হয়। তবে তিনি কখনো মুক্তিযোদ্ধা সনদের জন্য দৌড়াননি। তিনি নিজেই তার ছোটবেলা, নিষ্ঠাবান উন্নয়ন কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠা এবং মুক্তিযুদ্ধকালে বেঁচে যাওয়ার সেই রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা করেছেন তারই রচিত বিজ্ঞান কল্পকাহিনি 'মাহাকাশে মহাজয়'-এর লেখক বয়ানে :

'আমার জন্ম ১৯৫০ সালে। স্কুলে অংক আর পদার্থবিদ্যা ছিল প্রিয় বিষয়। 'কাল-পুরুষ' খুঁজতে রাতে আকাশে তাকিয়ে

নববর্ষের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ছেন

থাকতাম। কলেজে যেতে যেতে রাজনীতির হাওয়া লাগল গায়ে। 'মার্কস' সব সমাধান করে ফেলেছেন মনে হতো। এর মধ্যেই 'দর্শন' চেপে বসল মাথায়। সব গুলিয়ে যেতে থাকল। 'লেখাপড়া', 'জীবন' গুঁড়িয়ে গেল। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর করেছি। 'মুক্তিযুদ্ধে'র বলয় ইতোমধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে জীবনকে। পাকসেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। শরীরের ওপর অসহ্য অত্যাচার আর এগারো দিনে ১৯ জন সাথির মৃত্যু দেখতে হয়েছে নিজের চোখে, আর প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে মৃত্যুর। '৭৪-এ পড়াশোনা শেষ করে গ্রামের কাজে জড়িয়ে পড়ি, যা এখনো ছাড়তে পারিনি। মাঝে প্রায় দশ বছর 'জাতিসংঘ' ও 'বিশ্বব্যাংকে'র সাথে কাজ করতে গিয়ে পুরো পৃথিবীটাই প্রায় দেখা হয়ে গেল। বিভিন্ন দেশের মানুষ, তাদের যাপিত জীবন– এই সবকিছুতেই ভিন্নতার মাঝেও কোথায় যেন একটা ঐকতান রয়েছে বলে মনে হয়। কোথায় যেন বেজে চলেছে একই সুর। বিশ্ব-রাজনীতির অপভ্রংশও দেখতে হলো। দেখা হলো সবল-দুর্বলের সংঘাত, সবল কীভাবে তার শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে জাল বিস্তার করে রেখেছে সারা দুনিয়ায়। সব মিলিয়ে আমার জীবনটা যখন একটা গোলকধাঁধা, তখনই পাগলামির বশে এই বিজ্ঞান কল্পকাহিনির শিরদাঁড়াটা দাঁড় করাই।...'

তার জন্ম ১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের মধ্যপাড়া, জুবিলি রোডে। পিতা মরহুম জনাব এ. কে. এম. নূরুল হুদা, মাতা মরহুমা কাজী ওয়ালিমা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স করেন ১৯৭৪ সালে। এর পরপরই তিনি (১৯৭৫-১৯৭৬) গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস ওভারসিস (সিইউএসও) এবং বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এর সঙ্গে এবং গবেষণা উন্নয়নে অংশ নেন। তখন তার গবেষণার বিষয় ছিল 'রুরাল পাওয়ার স্ট্র্যাকচার, 'রুরাল লিডারশিপ', 'রুরাল পোভার্টি সিচুয়েশন' ইত্যাদি।

১৯৭৬ সালে তিনি প্রশিকায় যোগ দেন এবং সেখানে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পর্ষদ পর্যন্ত নানা পদে কর্মরত ছিলেন ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। প্রশিকা ছিল জাতীয় পর্যায়ে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি সংস্থাগুলোর অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি এ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি অর্গানাইজেশন : ইন্ডিয়ান স্যোসাল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া' সনদ লাভ করেন ১৯৮০-১৯৮১ সালে।

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি রিজিওনাল আফ্রিকা ডিডিএস প্রোজেক্টে ইংরেজিভাষী আফ্রিকার জন্য রিজিওনাল ডিডিএস স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ইউএনডিপি'র হয়ে জাম্বিয়াতে (১৯৮৭-১৯৯১ সাল) পাঁচ বছর কাজ করেছেন ডিডিএস কান্ট্রি প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে।

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাভিত্তিক পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ইউএনডিপি/বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রামে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৯৯২ সালের জুন থেকে ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত।

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)।

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ছিলেন ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ – জানুয়ারি ১৯৯৭)।

১৯৯৭ সালের মার্চ থেকে ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন গ্রামীণ ট্রাস্টের জেনারেল ম্যানেজার।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক।

দেশ-বিদেশের যেসব সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছেন: সরকারি, এনজিও, আর্ন্তজাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ– যেমন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও), ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) আয়োজিত দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো. খলিলুর রহমান ও তাঁর বামে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (প্রবীণের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন)

পরিমণ্ডলে অনেক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছেন তিনি। ১৯৯১ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত ইউএনডিপি/টিসিডিসি আয়োজিত এনজিও/গ্র্যাসরুটস ইনিশিয়েশন নেটওয়ার্কিং-এর ওপর কর্মশালায় অংশ নেন। নেপালে ইউএনভি আন্তঃসরকার সভায়ও যোগ দেন। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইউএনভি আয়োজিত প্রোগ্রাম অফিসারদের দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ইউএনডিপি/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রামের দুই সপ্তাহের 'ম্যানেজার্স ম্যানেজমেন্ট মিটিং'-এ যোগ দেন। ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়া হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন। ইন্দোনেশিয়াতে আইএলও/ইউএনভি/ইউএসসিএইচএস-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'আরবান পোভার্টি অ্যালেভিয়েশন' শীর্ষক সেমিনারে যোগ দেন। মালোয়েশিয়ায় এশিয়ান প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এপিডিসি) আয়োজিত 'ব্যাংকপুওর '৯৬' সেমিনারে অংশ নেন। ১৯৯৭ সালের ২-৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে এবং ১৯৯৮ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেন। ২০১৩ সালের ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর কাতারের দোহায় শিক্ষা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগ দেন সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহর সঙ্গে। ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর পিকেএসএফ আয়োজিত 'বিল্ডিং হিউম্যান ক্যাপাসিটি : এডুকেশন প্রোগ্রাম ফর দি এক্সক্লুডেড' শীর্ষক শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন। ২০১৬ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চীনে 'এক্সপোজার অ্যান্ড স্টাডি ট্যুর টু চায়না'তে সংস্থার তৎকালীন পরিচালক (প্রোগ্রাম) ফজলুল হক খানকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের ২১-২৮ মার্চ ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া প্যাসিফিক ফিনেনসিয়াল ইনক্লুশন সামিটে' অংশগ্রহণকারী সাত সদস্যবিশিষ্ট সিদীপ দলের নেতৃত্ব দেন।

প্রকাশনা

অহর্নিশ কর্মব্যস্ত থেকেও লেখা-পড়ার অভ্যাস ছিল আজীবন। দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার 'মহাকাশে মহাজয়' (বিজ্ঞান কল্পকাহিনি, ২০১৭, একুশের গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত) এবং 'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি' (কাব্যগ্রন্থ, ২০১৮, একুশের গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত)। নাটকও লিখেছেন তিনি। ২০০৫ সালে তার কাহিনি ও পরিকল্পনায় 'একদিন আমাদের গ্রাম' নাটকটির ভিডিও চিত্র ধারণ করা হলেও কারিগরি ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে তা আর প্রদর্শন করা হয়নি। তার নির্দেশনায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে তিনটি এবং সিদীপের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি (উন্নয়নে সিদীপ) তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। গ্রামের শিশুদের শিক্ষা নিয়ে কাজের পাশাপাশি ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে প্রকাশ করছেন শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'। তার সম্পাদনায় (যৌথভাবে) প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা-চিন্তকের শিক্ষা বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ 'আমাদের শিক্ষা : বিচিত্র ভাবনা' (২০১৯) এবং 'আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে' (২০২০)। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেন– সফল গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা নবীন উদ্যোক্তাদের সহায়ক হতে পারে। সেই চিন্তা থেকে প্রকাশ করেন 'উদ্যোক্তা উৎসাহ সিরিজ'-এর অধীনে দুটি গবেষণা গ্রন্থ– 'একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার জীবনসংগ্রাম' এবং 'একুশটি ব্যবসা: আপনার জন্য, দেশের জন্য'। তার অন্যতম সেরা উদ্ভাবন 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' (শিসক)-এর সামগ্রিক তথ্য উপাত্ত নিয়ে দিব্য প্রকাশ থেকে প্রকাশ হয় 'গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা'। এ ছাড়া বহু প্রামাণিক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তিনি সিদীপ থেকে।

তিনি থাকবেন চির অমলিন হয়ে

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

প্রতিটি মানুষের মৃত্যু নির্ধারিত। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মানুষের মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয়। তেমনি একজন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যার। আজও মনে হয় স্যার তাঁর বাসায় আছেন, আবার একদিন দেখা হবে। কোন ভাবেই মনে হয় না স্যার আমাদের মাঝে আর নেই। যে কারণে স্যারের এই চলে যাওয়া মেনে নিতে বেশি কষ্ট হচ্ছে।

তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিনি একজন প্রগতিশীল ও সৃজনশীল স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি একজন সফল উন্নয়ন সংগঠক, তিনি দেশ ও দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত একজন উন্নয়নকর্মী, তিনি একজন সমাজহিতৈষী, তিনি একজন কবি-লেখক, তিনি একজন কর্মবীর–এরকম নির্দিষ্ট কোনো বিশেষণে তাঁকে পরিচিত করানো সম্ভব নয়। সদাহাস্যোজ্জ্বল এবং অত্যন্ত কোমলপ্রাণ মানবিক গুণে গুণান্বিত একজন অসাধারণ মানুষ তিনি। তিনি তাঁর মানবিক গুণ ও ব্যবহার দিয়ে সকল মানুষকে খুব সহজেই আপন করে নিতেন। দীর্ঘ প্রায় বারো বছরের চাকরিকালীন তাকে কখনো রাগান্বিত হয়ে কথা বলতে শুনিনি। তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল হয়েছে, কিন্তু সেই ভুলকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে শুধরে দিতেন।

তিনি মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বাণী, উপদেশ, শ্লোগান, অঙ্গীকার ইত্যাদি লিখে ব্রাঞ্চে পাঠাতেন সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। একবার তিনি কোরআনের আয়াতও লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেটা হলো- "... বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে শুনে তোমার কাছে গচ্ছিত কিছুই আত্মসাৎ করো না ...", সূরা আনফাল, আয়াত: ২৭-২৮। সততার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উচ্চমানের। তিনি অপচয় করা পছন্দ করতেন না। মনে পড়ছে একবার একটি চিঠি তিনি রাফ কাগজে প্রিন্ট দিতে বলেছিলেন। আমি ভুল করে নতুন কাগজে প্রিন্ট করে স্যারকে দিয়েছিলাম। স্যার অনেক কথার মাঝে যে কথাটি বলেছিলেন সেটা হলো: 'প্রতিটি কাগজের মাঝেই আমার-তোমার সকলের বেতনের অংশ রয়েছে'। স্যারের সেই উপদেশ আমাকে অপচয় থেকে বিরত থাকতে আজও সচেতন করে। নীতিনিষ্ঠা ও চর্চার নিরিখে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান।

কাজ-পাগল মানুষটি সহকর্মীদের নিয়ে সময় কাটাতেও খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মধ্যেই তিনি সকলকে মিটিং রুমে জড়ো করতেন। অফিস সহকারী, কুক, ড্রাইভারসহ সকলের মুখ থেকে তাদের ও তাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন। সবার কণ্ঠেই শুনতে চাইতেন গল্প-কবিতা-কৌতুক-গান ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন কোন কবিতা। তেমনি একটি রুটিন অনুষ্ঠান ঈদুর ফিতর ও ঈদুল আযহার ছুটির আগে এবং ছুটি শেষে। উক্ত অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর আমেজ বিরাজ করতো। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য।

আত্মপ্রচারণার এ যুগে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ। নিজেকে আড়ালে রেখে নীরবে কাজ করে গেছেন। তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর করার পর তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের কাজে। এরপর দীর্ঘদিন জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকে কাজ করেছেন। কাজের সুবাদে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায় পুরো পৃথিবী। চাকরি জীবন শেষে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস' (সিদীপ) নামের সংস্থা। নীরবে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে উন্নয়নের মৌলিক ও সৃজনশীল চিন্তা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সিদীপকে গড়ে তুলেছেন দেশের শীর্ষসারির একটি এনজিও হিসেবে। তিনি এ সংস্থার মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবাকে পৌঁছে দিয়েছেন। স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে এবং ছোট্ট শিশুদের লেখাপড়া ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' (শিসক)-এর মাধ্যমে আলো ছড়িয়েছেন দেশের কয়েকশো গ্রামে। যার মডেল অনুসরণ করছে দেশের অনেক এনজিও। দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

"তোমরা সিদীপকে দেখো, আমি তোমাদের পরিবারকে দেখবো"–স্যারের মুখে এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় তিনি তাঁর হাতে গড়া সিদীপ সংস্থাকে এবং সিদীপের কর্মীদেরকে কতটা ভালোবাসতেন। তিনি সর্বদাই সংস্থাকে নিয়ে ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ভাবতেন। সিদীপের প্রায় ৫ হাজার কর্মীর অভিভাবক ছিলেন তিনি। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু হয় না কখনো। তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আদর্শের মাধ্যমে তিনি থাকবেন চিরঅমলিন হয়ে।

বিনম্র শ্রদ্ধা হে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমাজহিতৈষী, সার্বিক মানবিক কল্যাণে নিবেদিত উন্নয়নকর্মী, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল স্বপ্নদ্রষ্টা, কর্মবীর এবং কল্যাণচিন্তার অনুপ্রেরণাদায়ক আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক প্রকাশ

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
অর্থনীতিবিদ

আমার একজন অনুজপ্রতিম প্রিয় মানুষ এবং আমার প্রয়াত স্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের এক সময়ের সহপাঠী এবং সব সময়ের সুহৃদ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (Centre for Development Innovation and Practices, CDIP-এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা) করোনায় আক্রান্ত হয়ে আজ ভোরে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলো। আমার দেখা বাংলাদেশের এনজিও খাতের নেতৃত্বদানকারি এবং তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন কাজে নিবেদিত প্রাণ মানুষদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু প্রচারবিমুখ বলে হয়তো নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে অতটা সুপরিচিত নয়। তার প্রতিষ্ঠানের অনেক প্রকাশনা (যেগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ডের ছবিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ) ঘেঁটে তার একটি ছবিও পেলাম না, এমন কখনো দেখা যায়!

Syed Badrul Ahsan
Editor-in-Charge, The Asian Age

We lost Muhammad Yahiya today. A man of erudition, a scholar devoted to education, an individual of great humility possessed of a remarkable sense of humour, a friend as dear as life itself, he saw his life draw to a premature end today. It breaks the heart knowing that he now sleeps for all time in his grave....Until we meet again, my precious friend!

মোঃ ফজলুল কাদের
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ, ২২ আগস্ট ২০২০

Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আজ ভোরে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

উচ্চকিত আত্মপ্রচারণার এ যুগে সদা সলজ্জায় নিজেকে আড়ালে রাখা ইয়াহিয়া ভাই ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যানে স্নাতক এ মানুষটি ৭০ দশকের প্রথমার্ধেই তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন কাজের প্রেমে পড়ে যান। সে সময় এটা অভিভাবকদের কাছে একেবারেই কাম্য কোন কাজ ছিল না। এর পর আফ্রিকাতে জাতিসংঘের হয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করে ৯০ দশকের শুরুতে দেশে ফিরে CDF-এর প্রথম নির্বাহী পরিচালক হন। পরবর্তীতে তিনি গ্রামীণ ট্রাস্টে যোগ দেন।

৯০ দশকের শেষ অংশে তিনি CDIP প্রতিষ্ঠা করেন। আমার বিবেচনায় এটি দেশের সবচেয়ে efficient MFI যা Efficiencyর নিরিখে বিশ্বখ্যাত "আশা"কেও ছাড়িয়ে গেছে; প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক চিন্তা এবং অনুশীলন ছিল। সে লম্বা ফিরিস্তি এখন দেবো না। পরে বলার ইচ্ছা রইলো। অত্যন্ত কোমলপ্রাণ মানবিক একজন মানুষ ছিলেন। তার সততা ছিলো সুউচ্চমানের; আর্থিক এবং অ-আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই। নীতিনিষ্ঠ এই মানুষটি মুল্যবোধ ধারণ এবং চর্চার নিরিখে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি ছিলেন আমার বড় ভাই ও বন্ধু; একান্ত ঘনিষ্ঠ; হৃদয়ের কাছের একজন মানুষ। পৃথিবীতে থাকাকালীন দুনিয়াটাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ পাক তাকে তাঁর অপার রহমতের ছায়ায় ঢেকে দিন। আমিন। সুম্মা আমিন।

নোমান রবিন
চলচ্চিত্রনির্মাতা

তিনি ছিলেন একজন বটবৃক্ষ। একজন আলোকিত মানুষ। লক্ষ অবহেলিত শিশুদের জীবনে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন তিনি। বিখ্যাত এনজিও সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ভাই আমাদের মাঝে আর নেই। আজ সকাল ৭ টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না.... রাজিউন। আমি তাঁর স্নেহধন্য। আপনি ওপারে ভাল থাকবেন। আল্লাহর কাছে আর্জি থাকল আপনার সাথে যেন আবার দেখা হয়। সৃষ্টিশীল আড্ডার আকুতি পুষে রাখলাম।

শুচি সৈয়দ
সাংবাদিক

আহা, প্রিয় ইয়াহিয়া ভাই। অনেক আপন হয়ে উঠেছিলেন আপনি, দেশ এই দুঃসময়ে আপনার মত একজন মানবিক উদ্যমী ব্যক্তিত্বকে হারালো। আপনাকে স্যালুট করোনা কালের বীর। কৃষকের শস্য মাঠ থেকে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে কত বড় কাজ যে আপনি করেছিলেন তা বলে বোঝানো যাবে না। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বেহেস্ত নসিব করুন।

আব্দুল আউয়াল

নির্বাহী পরিচালক, সিডিএফ

উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ (CDIP)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আজ ভোরে আমাদের সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন (ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজিউন)। গত সপ্তাহখানেক ধরেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি সিডিএফ-এর প্রথম নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। প্রান্তজনের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে ইয়াহিয়া ভাই সিদীপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রচারবিমুখ এই ব্যক্তিত্ব আমৃত্যু সিডিএফ-এর গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতী সন্তান এবং সিডিএফ বিচক্ষণ নেতৃত্বকে হারাল। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আল্লাহ তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই শোক বইবার শক্তি এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল আমাদের আরও একজন প্রিয় মানুষের প্রাণ। গত ২২ আগস্ট ২০২০ তারিখে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)" এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আমাদের সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে পদক্ষেপ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা পরম করুণাময়ের কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। বেসরকারী একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তিনি লাইফ সাপোর্টে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকারী ও মানবিক গুনাবলীর অধিকারী জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে নিজ জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ যা আজ দেশের প্রথম সারির উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। দেশ ও দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং সার্বিক মানবিক বিকাশে তাঁর উদ্ভাবনী ধারণা শুধু সিদীপ নয়, অন্য অনেক উন্নয়ন সংস্থাও অনুসরণ করছে। সিদীপ আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে যার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ছিল জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সব শূন্যতা ও ক্ষতি পূরণ করা যায়না। তারপরও আমরা আশা করবো জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার অবর্তমানেও সিদীপ তার জনকল্যানমূলক কাজগুলো অব্যাহত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পূরণ করবে তাঁর স্বপ্নকে।

জাকির হোসেন

গতকাল ভোরে (২২ আগস্ট, ২০২০) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ইন্তেকাল করেছেন। ইয়াহিয়া ভাই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। শুনেছিলাম গত এক সপ্তাহ ধরেই তিনি লাইফ সাপোর্টে আছেন। ৭০-এ পা দিয়েছিলেন তিনি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে এই বয়সের একজন মানুষের লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার সংবাদ মনে আশংকার জন্ম দিয়েছিলো। তারপরও আশা করেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন, দেশের উন্নয়নে আবারও নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। সবাইকে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন তিনি।

ইয়াহিয়া ভাই কর্মজীবন শুরু করেন গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টে যোগদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি দাতাসংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন দেশে-বিদেশে। এই সেক্টরে বেশ সুখ্যাতি ছিলো তার। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-সিডিএফ এর প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিডিএফ-এর গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

অত্যন্ত বিনয়ী, প্রচারবিমুখ ও মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয় ইয়াহিয়া ভাই। প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে ১৯৯৫ সালে নিজ জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন উন্নয়ন সংস্থা "সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস-সিদীপ।" সত্যিকার অর্থেই উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। গত ২৫ বছরে দেশের প্রান্তজনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নে তার সংস্থা সিদীপের ভূমিকা ও সাফল্য দেখলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় এ কথা। ইয়াহিয়া ভাইয়ের মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যিকারের উন্নয়ন চিন্তাবিদকে হারালো।

আমি আশা করবো, সিদীপের মাধ্যমে যে মহৎ কার্যক্রম তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার মৃত্যুতে সেটা থমকে যাবে না। পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা তার কার্যক্রম ও উন্নয়ন চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি ইয়াহিয়া ভাইয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

২৩ আগস্ট, ২০২০

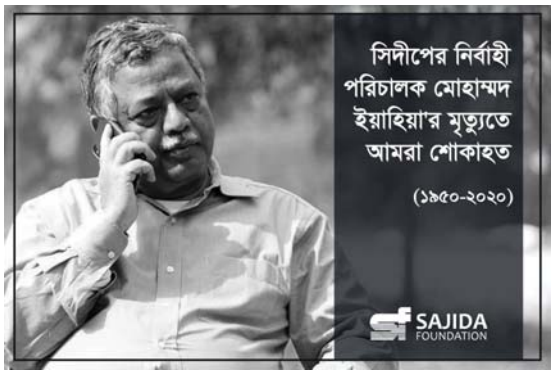

বিশিষ্ট উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব ও গণমানুষের কল্যাণে নিবেদিত উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আজ ২২ আগস্ট, '২০, সকাল ৭টায় ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ব্যক্তিগত জীবনে জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন বরাবর একজন সজ্জন ও নিরহংকারী মানুষ। প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯৫) থেকে সিদীপ খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের জন্য, তাদের জীবন বদলের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। টেকসই উন্নয়নের জন্য সিদীপ আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সিদীপ পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা মডেল সুধী মহলে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। অতি প্রান্তিক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন অগ্রণী।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিশেষত সিদীপ'র স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জনে তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন। প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন কর্মী-বান্ধব নির্বাহী প্রধান। সাহসী এ মুক্তিযোদ্ধা বরাবর দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার পরম শান্তি কামনা করি।

Rumi Rumi

জাতীয় শোকের মাসে কাকতালীয়ভাবে আমাদের পারিবারেও কয়েকটি শোকের ঘটনা ঘটে গেছে। আগস্টের এই ২২ তারিখেও ভোর বেলা একটা টেলিফোন আমাকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। আমার অতি কাছের ছোট কাকার না ফেরার দেশে চলে যাওয়া। এর আগে এ মাসেই আমার প্রিয় ফুফা ও আমার আম্মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমার এ ছোট কাকা ছিলেন আমার দাদা মরহুম এ. কে. এম. নুরুল হুদার চার ছেলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ছোট হওয়াতে অন্য ভাইদের কাছেও উনার আলাদা একটা আদর ছিল। বিশেষ করে আমার বাবার খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। উনি ছিলেন ভীষণ প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি, যে বাসায়ই যেতেন সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। ঢাকায় পড়ালেখা ও কমর্জীবনে ছোট কাকা আমাদের ও রুনু ফুফুর পরিবারের খুব কাছাকাছি ছিলেন।

উনি অনেকটা অন্তর্মুখী ছিলেন, নিজের কষ্টগুলি চাপা দিয়ে অন্যদেরকে ভাল রাখার চেষ্টা করতেন। পরিবারের ও পরিবারের বাইরে যে কারো দুঃসময়ে-দুর্যোগে এগিয়ে আসাটা ছিল উনার অনন্য গুণ।

আমাদের পরিবারে সবচেয়ে মেধাবী ও সৃজনশীল ছিলেন ছোট কাকা। নতুন কিছু করার স্পৃহা উনাকে তাড়া করে বেড়াত সর্বক্ষণ। তাই পেশাগত জীবনে উনার কর্মপদ্ধতি ও নতুনত্ব প্রতিটি কাজে কাকাকে সফলতা এনে দিয়েছিলো।

এ মুহূর্তে ছোট কাকাকে নিয়ে লিখতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাবতেই পারছি না উনাকে আর দেখব না। খুব অসময়েই উনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। উনার এ চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য এক অপুরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ উনাকে জান্নাতবাসী করুন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (জন্ম– ০১-১২-১৯৫০, মৃত্যু– ২২-০৮-২০২০) ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে মাস্টার্স করার পর যোগ দেন প্রশিকায়। এরপর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস ওভারসিস এবং বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড), গ্রামীণ ট্রাস্টের জেনারেল ম্যানেজার, সিডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইউএনডিপি/ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এর অধীনে পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, রিজিওনাল আফ্রিকা ডিডিএস প্রোজেক্ট এবং জাম্বিয়াতে ইউএনডিপি-এর ডিডিএস কান্ট্রি প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দেশ এবং দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, সার্বিক মানবিক বিকাশে তাঁর উদ্ভাবনী ধারণা শুধু সিদীপ নয়, অন্য অনেক উন্নয়ন সংস্থাও অনুসরণ করছে। গ্রামের দরিদ্র-অশিক্ষিত মা-বাবার সন্তানদের ক্লাসের পড়া তৈরি করিয়ে শিশুর সার্বিক বিকাশে তাঁর উদ্ভাবিত 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' প্রাইমারি স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে কার্যকর বলে প্রমাণিত। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সংস্থা হিসেবে এই সংস্থা সিটি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। তার রচিত গ্রন্থ– মহাকাশে মহাজয় (বিজ্ঞান কল্পকাহিনী) এবং কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি (কাব্যগ্রন্থ)।

শোকাহত

মোঃ আমিনুল ইসলাম
এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার (অডিট)

১

আমি যুগ যুগ ধরে খুঁজে ফিরছি কাকে
চিনেও চিনতে পারছি না তাকে

তারই ছোঁয়ায় ও পরশে বিভোর থাকি
ধ্যান ও ধারণায়
চিন্তায় ও কল্পনায় ছবি আঁকি।

কিন্তু ? এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও পাই না তাকে
শুধু মনে পড়ে তাকে আবছা-আবছা
কিন্তু মনে পড়ে না তাঁর অবয়ব
কিংবা দৃশ্যমান ছায়া।

তবে মনে পড়ে
শিরায়-শিরায় বহমান রক্তের ফোয়ারা
যার গভীরে 'অনুভূত' হয় স্পন্দন ও নিঃশ্বাস।

আবার কখনো কখনো তারই চিৎকার
কখনো হতাশার 'সুরে' বাজে ঝংকার
কখনো বা হুংকার!
চারদিকে মনে হয় শুধু হা-হা-কার।

আবার কখনো শান্তির আশ্বাসে
অপলক নেত্রে বিফল চাহনি
তাকে পাবার প্রত্যাশায়!

কিন্তু কোথাও মেলেনি তাকে
ব্যর্থ হয়ে বার বার আসি ফিরে
পিছন ফিরে, মনে হয় যেন
সে আমাকেই ডাকে ...

২

মোদের শেখাবে কে?
সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার গান
শুনাবে কে শান্তির বাণী
ভালোবেসে ডাকবে কে?
সে যে আজ পরলোকবাসী।

না! না! তিনি মরিয়াও 'অমর'
রেখে গেছেন তাঁর কীর্তি
যা দেখে শিখবো মোরা
বিলাবো তাঁর আদর্শ-নীতি।

অতি যতনে গড়ে তোলা এক প্রাণ
হাজারো ঝড় ঝাপটায় নেভেনি যে প্রদীপ
নাম তার রেখেছিল 'সিদীপ'।
যার ছায়াতলে আছি মোরা
বহু জোড়া বহু পরিবার।

তাই বজ্রকণ্ঠে মোদের অঙ্গিকার
হাজারো ঝড় ঝাপটায় নেভেনি যে প্রাণ
তা রক্ষায় থাকবো না মোরা নির্বিকার।

তোমারই দেখানো পথে হেঁটে হেঁটে
তোমারই স্বপ্ন বাস্তবায়নে
মহাকর্মযজ্ঞের মিছিলে, একে একে
দল বেঁধে আসবে শিসক-শিক্ষালোক
শিশু-কিশোরের মেধাবিকাশ
মানবতার সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
আমি তুমি আর সে।

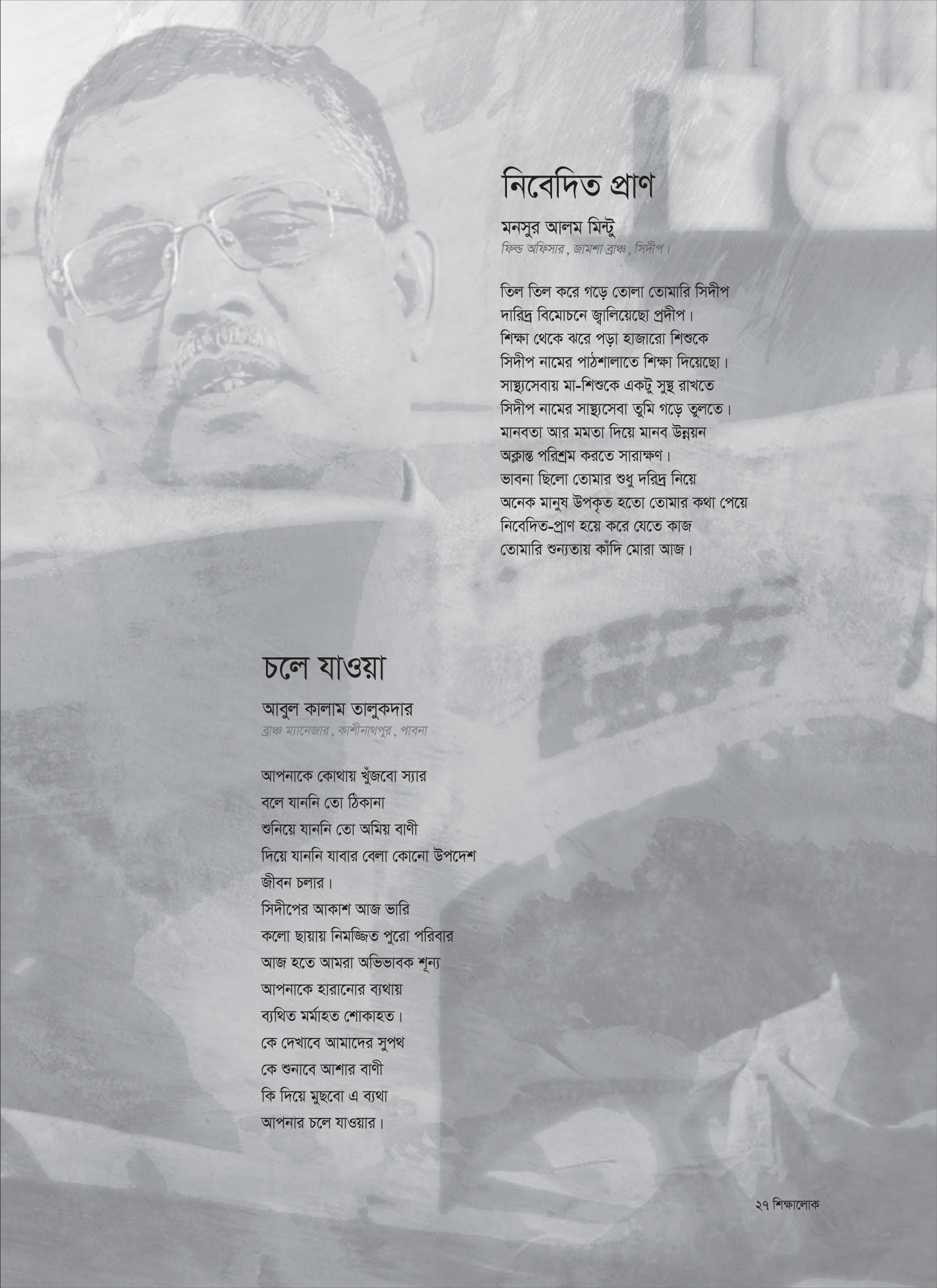

নিবেদিত প্রাণ

মনসুর আলম মিন্টু
ফিল্ড অফিসার, জামশা ব্রাঞ্চ, সিদীপ।

তিল তিল করে গড়ে তোলা তোমারি সিদীপ
দারিদ্র বিমোচনে জ্বালিয়েছো প্রদীপ।
শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া হাজারো শিশুকে
সিদীপ নামের পাঠশালাতে শিক্ষা দিয়েছো।
সাস্থ্যসেবায় মা-শিশুকে একটু সুস্থ রাখতে
সিদীপ নামের সাস্থ্যসেবা তুমি গড়ে তুলতে।
মানবতা আর মমতা দিয়ে মানব উন্নয়ন
অক্লান্ত পরিশ্রম করতে সারাক্ষণ।
ভাবনা ছিলো তোমার শুধু দরিদ্র নিয়ে
অনেক মানুষ উপকৃত হতো তোমার কথা পেয়ে
নিবেদিত-প্রাণ হয়ে করে যেতে কাজ
তোমারি শুন্যতায় কাঁদি মোরা আজ।

চলে যাওয়া

আবুল কালাম তালুকদার
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, কাশীনাথপুর, পাবনা

আপনাকে কোথায় খুঁজবো স্যার
বলে যাননি তো ঠিকানা
শুনিয়ে যাননি তো অমিয় বাণী
দিয়ে যাননি যাবার বেলা কোনো উপদেশ
জীবন চলার।
সিদীপের আকাশ আজ ভারি
কলো ছায়ায় নিমজ্জিত পুরো পরিবার
আজ হতে আমরা অভিভাবক শূন্য
আপনাকে হারানোর ব্যথায়
ব্যথিত মর্মাহত শোকাহত।
কে দেখাবে আমাদের সুপথ
কে শুনাবে আশার বাণী
কি দিয়ে মুছবো এ ব্যথা
আপনার চলে যাওয়ার।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার একগুচ্ছ কবিতা

সমুদ্রে যাব না

যে কোনো সচেতনতা আমাকে সতর্ক করে
সকল সতর্কতা আসলে আমার স্বাধীনতা হরণ করে।
চেতনার যে কোনো মূল আমি উপড়ে ফেলতে চাই
চেতনা আমার বেদনা বাড়ায়।

আমার কোনো অহং থাকবে না
কেউ আমাকে মোহিত করবে না
প্রকৃতি আমাকে ভাবাবে না
পারিপার্শ্ব আমাকে ছোঁবে না
মনিষীরা আমাকে বিপথে নেবে না
তোমার চোখ আমাকে স্বপ্ন দেবে না
ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বলে আমি চিৎকার করবো না

সমুদ্রে যেতে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই
আমি নির্বিকার থাকতে চাই
সাধারণ্যে বিলীন হতে চাই।

আমি নির্বিকার থাকতে চাই
কোনো জ্ঞান আমাকে আলোড়িত করবে না
যারা সমুদ্রে যায়, যাক
আমি নির্মোহ, আমি সমুদ্রে যাব না।

অঢেল সুখ

মৃত্যু একটা তোরণ মাত্র
পেরুতে পারলেই ঝকঝকে সুন্দর
ভীতসন্ত্রস্ত আমি
শুধু, তোরণের কাছে যেতে চাই না।
কী ভয় আমার? সুন্দরের কাছে?

শরীরে কষ্ট, মনে কষ্ট
কষ্টের প্রাচীর চার ধারে।
এর চেয়ে তোরণ পেরুনো
অনেক ভালো নয় কি?

প্রশ্ন আছে, সমাধান নেই।
কষ্ট আছে, বোধ আছে, নিস্তার নেই
মুহূর্তের আনন্দের পর,
শুধু প্রলম্বিত কষ্ট
শুধু বাড়ে, দীর্ঘায়িত হয়।
এর চেয়ে তোরণ পেরোনো ঢের ভালো
ওখানে অঢেল সুখ।

দূরে কেউ

একটা ছোট্ট পাখি বসেছিল
লম্বা টানানো সূতোর শেষ প্রান্তে
এ প্রান্তে আমার টানানো রুমাল
কাঁপছিল।

বোকা রুমাল কখনো জানেনি
কেন সে কাঁপছিল।
রুমাল নড়ছিল, কাঁপছিল
সাথে আমিও কাঁপছিলাম।
একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছিল
আমিও কেঁপেছিলাম
জানিনি, কেন।

আজকাল সময়ের সূতোয়
বড় টান পড়ে
দূরে কেউ হয়তোবা বসে থাকে
তার ছায়া পড়ে আমার বুকে।
কাঁপে নদী, কাঁপে চিল, নীল আকাশ
বাতাসে কাঁপে ঘাসের ডগা
আমার বুকের ভেতর।

তুমি এলে

উগান্ডার বুক বেয়ে নীল নদের জল
মিসরে এসে স্ফীতবক্ষা হয়েছে
হিমালয় থেকে নেমে যমুনা
তোমার-আমার জীবন প্লাবিত করেছে।
রাইন নদীর ঘোলাজল
আমাজনের বৃক্ষরাজি
চিরকাল বয়ে যায় তোমার-আমার ভেতর।

শীর্ণকায় নদীগুলো
বৃষ্টির অপেক্ষায় বুভুক্ষু যখন
সাদা মেঘ ধেয়ে যায়
আমার হৃদয় তখন কাঁপে
তুমি আসবে বলে।

তুমি এলে তরল জ্যোৎস্না দিয়ে
আমি তোমার গা ধুয়ে দেব।

বসন্ত

বসন্ত বড় শুষ্ক
তোমার পেলব দেহ নেই
বাহুতে আঁচড় পড়ে
শুকনো, খসখসে
তুমি উদাস তো থাকোই।
গাছেরা শুকিয়ে গেছে
অতি আপন পাতাও
বোঁটা ছেড়ে দেয়। বসন্ত
বড়ই আলাদা করে
আমাদের।
খসে পড়া পাতা
শুকনো গড়ায়
একটু বাতাসেই শব্দ তোলে
শিশুর আঙুলে গিটারের তার।
ফুল ফুটবে, ফোটেনি এখনো
পাতা আসবে, আসেনি এখনো
শুকনো বসন্ত, শুষ্ক তোমার ঠোঁট
কবে আসবে জল,
কবে হবে ঝর্ণায় গাহন?

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক কিছু কবিতা

শিরোনামহীন–এক

১.
একি প্রবল জ্বর
উড়িয়ে নিচ্ছে সবই
খড়কুটোর মতো
আমার দম্ভ, আমার অহংকার।
কি বিশাল প্রাসাদ গড়েছিলাম
জীবেদের শ্রেষ্ঠ জীব বলেই
তাসের ঘরের মতো ভাঙছে
তার প্রয়োজন।

গর্তে ঢুকে গেছি যেন
মনুষ্যত্বের সেই সূচনায়
যখন আমরা থাকতাম গুহায়
নিশ্চুপ বেরিয়ে আহার কুড়াতাম
ভয়ে বিশাল প্রাণীর।
আজও মাস্ক সেঁটে গ্লাভস এঁটে
ভয়ে নিশ্চুপে মলে গিয়ে আজো
নিয়ে আসি সপ্তাহের খাবার।

ভেবেছিলাম, আরতো বেশিদিন নয়
সবকিছু জয় করে ফেলব
বিশ্বের, ব্রহ্মাণ্ডের
গত একশ বছরে জীবনের সময়সীমা
দ্বিগুণ করে ফেলেছি, তাই মৃত্যুটাও
হয়ে যাবে জয়। আনন্দ –
এক মেডিসিনেই
এসে যাবে হাতের মুঠোয়।
ভগবানের সব শক্তি
ক্রমাগতই আমার হবে।
'হারারি'র সেপিয়েনস
আর হোমো-ডিয়োস
বড় আবেগি করেছিল আমায়।

২.
দৃষ্টি ছিলো দূরে, বহুদূরে
কাছে তাকাইনি। দেখিনি, ভাবিনি
ক্ষুদ্রও কত প্রবল হতে পারে।

বিশ্ব বা সারাবিশ্বটা কি শুধু মানুষের
পৃথিবীর ভেতরে
আরো কত পৃথিবী আছে
যে আমার বোধের বাইরে।
'করোনা'কে তো জানি,
ক্ষুদ্র এক অনুকণা
অস্তিত্বে সে 'ভাইরাস'
জীবন ও অজীবনের মাঝখানে কিছু
পৃথিবীটা 'করোনা'রও।
আর কোন কোন কণাদের?
কে জানি আমরা।

পৃথিবী কি আরো অনেকের
যা আমার বোধের মাঝে নেই?
যে কণা নয় অন্যকিছু?
ক্ষুদ্রের বা বৃহতের
যা আমার নেই।

কেউ কি এমন আছে যে
এক লহমায় গিলে নিতে পারে
গোটা পৃথিবীটাকে
মানুষই তো বলে,
আছে 'ব্ল্যাক-হোল' যার
জানে না মানুষ কিছুই।

এই ক্ষুদ্র আর বৃহতের মাঝখানে
কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা?
এত জ্ঞান, এত অহংকার,
এত তথ্য, এত বিশ্লেষণ,
এত দম্ভ নিয়ে?

শিরোনামহীন–দুই

১.
যদি আজ রাতেই করোনারা
পৃথিবী থেকে পালিয়ে যায়
ধোয়া মোছা হয়ে যায় এই পৃথিবী
যদি কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যায়
আর কোন মানুষ বা প্রাণী করোনায় আক্রান্ত না হয়
আক্রান্তরা সব ভাল হয়ে যায়।

কাল সকালেই যদি মাস্ক ছাড়া বেরুনো যায়
খোলা যায় দুয়ার
'আর আবদ্ধ নই' বলে চিৎকার করে
রাস্তায় বেরুনো যায়
যদি নির্মল হাওয়ায় এক নূতন পৃথিবী দেখি

যদি জেগে উঠি শেক্সপিয়রের ভালবাসার পৃথিবীতে
যদি তোমার হাত ধরে হাঁটতে পারি
অনেক মানুষের ভিড়ে
তোমার হাতে তুলে দিতে পারি একটি গোলাপ
চুলে গুজে দিতে পারি একটি রক্তজবা
যদি ছ'ফুট দূরত্বের বেড়ি আর না থাকে
যদি ইঞ্চিরও বাধা না থাকে তোমার-আমার
রবি ঠাকুরের গান যদি চলে শিরায় শিরায়।

যদি বাজার-হাট সব খুলে যায়
যদি খুলে যায় ক্রিকেট স্টেডিয়াম
সাকিবের ছক্কায় লাফিয়ে ওঠে লাখো মানুষ।
সবাই কাজে যায়,
সেলাইদিদি আবার টাকা পাঠাবে বাড়ি
কৃষক কাটবে ধান আবার মনের খুশিতে

২.
যদি আগামীকাল আর আতঙ্ক না থাকে
আর না শুনতে হয় মৃত্যুর নূতন সংখ্যা
আক্রান্তের নূতন কারো নাম
যদি শবযাত্রা হয় স্বাভাবিক, জানাজার নামাজ
মৃত্যু যেন না বলে, দেখতে যাব না তোমায়।

যদি আগামীকাল থেকে জেগে ওঠে
এক নূতন পৃথিবী
প্রকৃতির সাথে নেই কোন বিরোধ
আর নয় পৃথিবীকে কুরেকুরে খাওয়া
মানুষগুলো যদি বদলে যায়
শক্তির দাপট নয়, ক্ষমতার হুংকার নয়
যদি হয় পৃথিবী ভালবাসার, নির্মল আনন্দের

যদি আগামীকাল হয় স্বাধীনতা
মানুষের, প্রাণীদের, গাছেদের আর পৃথিবীরও।

শিরোনামহীন–তিন

নিজেকেই ভয় করছে
ভয় করছে নিজেকে দারুণ
যদি হাঁচিকাশি হয়, যদি হয় জ্বর
রিপোর্ট আসে পজেটিভ
কি হবে আমার প্রতিবন্ধী ছেলেটার
সে তো জড়িয়ে থাকবে গলা
শুয়ে থাকবে পাশেই
যতই দরোজা আটকে রাখি
বলি তাকে ছুঁয়ো না আমায়
আমার ছোঁয়াচে মরণ ব্যাধি

নিজেকেই বড় বেশি ভয়
মরে গেলে ছুঁয়ো না কেউ
কী দ্বিধায় কাটাবে আপনজন

কেউ এসো না আমার শেষকৃত্যে
আমি কিছুতেই কারো অসুস্থতার
কারণ হতে চাই না
আমি যেন আর কাউকে
শেষ করে না দেই।

শিরোনামহীন–চার

বেঁচে থাকা মানে কি
শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া
হাত-পা নাড়ানো, নাওয়া-খাওয়া
তোমাকে ভালবাসা, কাজে যাওয়া
হেঁটে যাওয়া, দূরে কাউকে দেখতে যাওয়া
ঘুরে বেড়ানো দেশ-দেশান্তরে
নদীর পাড়ে, গাছের ছায়ায় ছায়ায়
বনের ভেতর ছোট পথে
শুকনো পাতায় পাতায়

বেঁচে না থাকা মানে কি ...

গরিব-প্রান্তজনের অস্তিত্ব-জাগানিয়া অর্থনীতি

শাহজাহান ভূঁইয়া

স্বাধীনতা ও তার ঠিক পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অবস্থা কি আমাদের মনে আছে? বিরাট অর্থনৈতিক সংকট তখন সরকারের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলো– ভেঙে পড়া অর্থনীতির চাকা সচল রাখা। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সব মানুষ ও ফিরে আসা শরণার্থীদের বেঁচে থাকার জন্য খাবার সরবরাহ ও পুনর্বাসন। এ কাজে তখন সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সকলের সম্মিলিত চেষ্টা মানুষের দুর্ভোগ প্রশমন করতে ও তাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মধারায় ফিরে আসতে সহায়তা করতে পেরেছিলো।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওরা তখন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের তাদের প্রথম প্রজন্মের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকৌশল প্রয়োগ করেছিলো। পরে এই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিকে প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে সামাজিক ও টেকসই ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল দিয়ে যার উদ্দেশ্য ছিলো দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন। ক্রমে এই টেকসই ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মকৌশল আরও বিকশিত হলে ক্ষুদ্রঋণ অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে যারা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়, তারাও আর্থিকসেবা লাভ করতে পারে। এভাবে যাতে নিজেদের আয়, ভোগ, সঞ্চয় বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তবর্তী মানুষও উন্নয়নের ছোঁয়া লাভ করতে পারে।

২০২০ সালে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে করোনা মহামারির প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশও এ দুর্যোগের শিকার। অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা এই মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে শুরু করেছে। তবে পরিস্থিতি দাবি করছে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি বেশি মনোযোগ। বেঁচে থাকার অবলম্বনস্বরূপ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে পুনরায় যুক্ত করে দিতে হবে যাতে সরকার ও সেবাব্রতী সংস্থাগুলোর প্রদেয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ওপর নির্ভর না করে তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

অস্তিত্ব-জাগানিয়া অর্থনীতিকে অর্থনীতির কোনো নতুন রূপ বলা যাবে না। এ হচ্ছে চাহিদার নিম্নগতি আটকানোর একটা উপায় এবং সাথে সাথে এ হচ্ছে যোগ্য আর্থসামাজিক সংস্থা কর্তৃক যথাযথ সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির উদ্যোগ। এ অর্থনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে তারা যাদের পক্ষে মূলধারার আর্থিক সেবা প্রদানের প্রতিষ্ঠানে যাওয়া কঠিন। কভিড-১৯ সংকট অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিনিময় কমিয়ে দিয়ে প্রান্তিক অর্থনীতির ওপর আঘাত হেনেছে। এর ফলে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের আয় হ্রাস পেয়েছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মহীন ও চাকুরিহীন মানুষ যদি আবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়, বাণিজ্যিক বিনিময় শুরু হবে ও তাদের আয় বাড়তে থাকবে। অর্থনৈতিক আদান-প্রদান কমে গেলে আয় কমে যায়, অন্যদিকে আয় সম্প্রসারণ ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এই আদান-প্রদান বাড়ানো যায় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বেশকিছু এনজিও-এমএফআই বা ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা যারা মূলধারার আর্থিকসেবা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কাজ করছে। দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষকে প্রয়োজনীয় সেবাদানের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যে তাদের যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। সাধারণত এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকেই তারা তাদের সেবা দিয়ে থাকে। এসব মানুষ এমন ধরনের অর্থনৈতিক কমকাণ্ডে যুক্ত যে তাদেরকে বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় না, ফলে তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ে ঝুঁকি খুবই কম। অনেক এনজিও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদানের পাশাপাশি টেকসই মানব-উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবাও দিয়ে থাকে।

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে না। তাদেরকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) অধীনে কাজ করতে হয়। সেবাদানের জন্য তারা যে সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে তার পরিমাণ উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে থাকে। সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সেবার খরচ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেহেতু আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহে বিদেশি অনুদান কোনো টেকসই আর্থিক উৎস হতে পারে না, পিকেএসএফ ও আরও কিছু স্থানীয় আর্থিক সংস্থা টেকসই আর্থিক উৎস হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের সিডিএফ (ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম) নামে একটা শীর্ষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ করে থাকে যা স্বার্থসংশ্লিষ্ট আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কেউ কাজে লাগাতে পারেন।

কভিড-১৯ মহামারি একটা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ আকারে হাজির হয়েছে। তবে মানুষ কখনও পরাজিত হয়নি। অতীতে তাকে বহু সংকট মোকবিলা করে আগাতে হয়েছে। এবার এ মহামারির সংকটও মানুষ ঠিকই মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির এই ধাক্কা সামলে ওঠার সক্ষমতা আছে। সরকার ও সংশ্লিষ্টজনেরা হয়তো গরিব-প্রান্তজনের অস্তিত্ব-জাগানিয়া অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে এ সমস্যার একটা ভাল সমাধান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে এনজিও-এমএফআইরা তাদের সেবাকাঠামো ভালভাবে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। সরকার ও জনগণের বন্ধু হিসেবে তারা যে ভালভাবে এ কাজ করতে পারবে তা বিশ্বাস করা যায়।

লেখক একজন ডেভেলপমেন্ট প্রোফেশনাল ও কলামিস্ট

করোনা-দুর্যোগে কৃষকের পাশে দাঁড়াতে হবে

করোনার আক্রমণ সারা বিশ্বকে থমকে দিয়েছে আর শীঘ্র এ থেকে উত্তরণ আশা করা কঠিন। বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। তা করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে যেমন, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণেও অনেক। করোনায় সংক্রমণ বিস্তার ও মৃত্যু ছাড়াও মানুষের জীবনে হানা দিয়েছে বেকারত্ব, ঘরে খাদ্যের অভাব, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন রোগে ও অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবসহ অনেক কিছু।

কৃষিমন্ত্রী বলেছিলেন করোনায় উদ্ভূত পরস্থিতিতে কৃষিপণ্যের বিপণন এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ১৬ মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইনে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন: বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে বাংলাদেশের শাকসবজি ও মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের পরিবহন এবং বাজারজাতকরণে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারছে না। বড় শহরের বাজারে ক্রেতার আগমন প্রায় না থাকায় ও জনগণের আয় হ্রাস পাওয়ার কারণে বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, ফলে পাইকার ও আড়তদারগণ কৃষিপণ্য ক্রয়ে আগ্রহ হারাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? কৃষি উৎপাদনের সাফল্য ধরে রাখা, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দেশের সর্বত্র পৌঁছানো এবং সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য তা কেনা ও পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও এসময়ে খুব কঠিন কাজ। এনজিওরা সমন্বিতভাবে ও সরকারের সঙ্গে এক্ষেত্রে কিছু কাজ করতে পারে। গ্রামে কৃষকের মাঝে সিদীপের একটি উদ্যোগে এমনই একটা নমুনা দেখা যায়।

এবার নাটোর জেলার গুরুদাসপুরে কয়েকটি গ্রামে বাঙ্গি ও রসুনের ভাল ফলন হয়েছে। এ জেলার বনপাড়ায় অনেকে পেয়ারা চাষ করেন ও সেখানে এর ভাল ফলন হয়েছে। পাবনা জেলার সাঁথিয়া, আমিনপুর ও সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পিঁয়াজের ফলন ভাল। এ জেলায় বেড়া ও সাঁথিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে চালকুমড়া চাষ হয়। এসব কৃষকের অনেকে এনজিওটির কাছ থেকে এসএমএপি প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক বছর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব, সিলেট, বগুড়া, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা হতে বেপারি এসে ট্রাক ভর্তি করে এসব কৃষিপণ্য কিনে নিয়ে যান। কিন্তু এ বছর করোনা ভাইরাসজনিত সংকটের কারণে কৃষকেরা তাদের ফসল বিক্রি করতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন।

এমন পরিস্থিতিতে এনজিওটির স্থানীয় কর্মীগণ বেপারিদের সাথে ও ট্রাক ড্রাইভারদের সাথে যোগাযোগ করেন। এখন প্রতিদিন গুরুদাসপুর হতে ২০/২৫টি ট্রাক নিয়মিত বাঙ্গি বহন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। বনপাড়া হতে ৮/১০টি ট্রাক নিয়মিত পেয়ারা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। পাবনার উক্ত গ্রামগুলো থেকে পিঁয়াজ ও চালকুমড়া বিক্রি হয়ে প্রতিদিন ২/৩টি ট্রাকে করে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ফলে লাভলী, লাইলি, বাদলী, মাসুদা, নুরুন্নাহার, রিনা, রাজিয়া, আছিয়া, খাদিজা, জাহানারা, হাসিনা, বজলুর, আক্কাস, ইলিয়াছ, ইনসানি, খালেদা, খোদেজা, মনোয়ারা প্রমুখের মুখে হাসি ফুটেছে।

সংস্থাটির এরূপ উদ্যোগের ফলে একইভাবে গাজীপুরে মাওনায় কয়েকটি গ্রামে ডিম ও দুধ উৎপাদনকারী, কুমিল্লার মাধাইয়ায় দুগ্ধ-খামারি ও নিমসারে ডিম-উৎপাদনকারী ক্ষুদে উদ্যোক্তাগণ আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। তারা এখন ন্যায্যমূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে পারছেন। ট্রাকচালকদের সহায়তায় সেগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলে যাচ্ছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন উৎপাদনকারী, পাইকার, ট্রাকশ্রমিক, ভোক্তাসহ সবাই।

দেখা যাচ্ছে কারও এমন সামান্য উদ্যোগ কৃষককে সঠিক সময়ে ন্যায্য মূল্য পেতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করে। কৃষিপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করে। উৎপাদনস্থল থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দিতে কাজে লাগে। এসময়ে কৃষকের সঙ্গে বিক্রেতা ও ভোক্তার যোগাযোগ তৈরি করে দেয়া একটা জরুরি কাজ। গ্রাম এলাকায় যোগান এবং শহর ও উপশহর এলাকায় চাহিদার মাঝে ভারসাম্য স্থাপন এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সরকারের সঙ্গে একত্রে এ ধরনের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন যা করোনাদুর্যোগ মোকাবিলায় কিছু ভূমিকা রাখবে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসহ সকলে একত্রে যত দ্রুত সম্ভব এ গভীর সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করা যাবে।

করোনাকালের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ

অলোক আচার্য

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে কার্যত পুরো বিশ্বই এখন থমকে আছে। অন্য খাত কোনোভাবে চালু হলেও শিক্ষা কার্যক্রম এখনও বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। করোনাভাইরাস যখন থেকে তার ভয়ংকর রুপ দেখাতে শুরু করে তখন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। আমাদের দেশেও শিশুদের মাঝে যাতে এই ভাইরাস ছড়িয়ে না পরতে পারে সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু হচ্ছে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে করোনার প্রভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ পিছিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে উচ্চশিক্ষায় দীর্ঘ সেশন জট তৈরি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে থমকে আছে এইচএসসি পরীক্ষা। এই শিক্ষার্থীরাই এইচএসসি পাস করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য পা বাড়ায়। অনুষ্ঠিত হয়নি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। এখন সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

করোনার মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বাড়িতে বসেই শিক্ষার্থীরা মোবাইলে ফল জানতে পেরেছে। সারা বিশ্বেই শিক্ষার্থীরা ঘরে সময় কাটাচ্ছে। যে সময়টা আপনার আমার সন্তান স্কুলে হেসেখেলে পার করতো সেই সময়টাই এখন তারা পার করছে বাড়িতে বসে। নিজেদের পাশাপাশি এই সময়টা তারা কিভাবে পার করছে, তাদের ভেতর আতঙ্ক আছে কি না তার খোঁজ রাখতে হবে। স্কুল বন্ধ মনে করে একেবারে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাই এটুআই-এর সহযোগিতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) টেলিভিশনে ক্লাস চালু করেছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে, বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে যেন লেখাপড়া থেকে দূরে না সরে যায় সেজন্যই আমার ঘরে আমার স্কুল নামের এই ব্যবস্থা। সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তা আবার পুনঃপ্রচারও হচ্ছে। এসবই হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে। নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ। এই আইডিয়াটা অভূতপূর্ব! তবে সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ নতুন। এটা কতটুকু ইতিবাচকভাবে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে এর সফলতা। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এভাবে ক্লাস করানোর এই ধারণা ছাত্রছাত্রীর করোনাকালীন ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি চমকপ্রদ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এর সফলতা নিয়ে। অর্থাৎ এতে ছাত্রছাত্রী প্রকৃতপক্ষে কতটা উপকৃত হচ্ছে? যারা উপকৃত হচ্ছে সেই হার কত? আমাদের মনে রাখতে হবে, টেলিভিশনে ক্লাস শহর থেকে গ্রাম সব স্তরের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশেই নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কতজন শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে এই ক্লাস মনোযোগ সহকারে টেলিভিশনের পর্দায় দেখছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গবর্নমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনার প্রাদুর্ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় উল্লেখযোগ্য হারে কমছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময়। মনে হতে পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার সময়ে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পড়াশোনার সময় বৃদ্ধি হওয়ার কথা। কিন্তু গবেষণায় উঠে এসেছে, বাড়িতে শিক্ষার্থীদের নিজেদের পড়ালেখার হার কমেছে অনেকটাই। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী টেলিভিশনে 'ঘরে বসে শিখি' ও 'আমার ঘরে আমার স্কুল' এই অনুষ্ঠান দুটি দেখে এবং ১ শতাংশ শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। অথচ টেলিভিশনে ক্লাস নেয়ার উদ্দেশ্যই হলো বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করে, তাদের ক্ষতির মাত্রা কমতে পারে ও নিজেরা লেখাপড়ার মধ্যে থাকতে পারে। আমাদের এই পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে হবে। আপাতত এই ব্যবস্থা শ্রেণি পাঠদানের বিকল্প হিসেবে উপযুক্ত করে তোলার প্রয়াস করতেই হবে।

বিপদ হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা বইয়ের কাছে থাকছে না। তাদের রাখা যাচ্ছে না। গ্রামেগঞ্জে অনেক শিশুই পরিবারের জন্য উপার্জনে সময় কাটাচ্ছে। করোনায় সারা বিশ্বেই ছাত্রছাত্রীর অবস্থা প্রায় একই রকম। শিক্ষার্থীদের নিরাপদে রাখাই অগ্রাধিকার। কিন্তু এর মধ্যেই কিভাবে তাদের বাড়িতে বইয়ের কাছে ফেরানো যায় তা নিয়েও পরিকল্পনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই ছিল মেধা ও প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত মঞ্চ

শিক্ষা বলতে আমরা কেবল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হওয়াকেই বুঝি। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অর্থ যে মানুষের মনকে উন্নত করা তা অধিকাংশ সময়ই আমরা ভুলে যাই। একটা জাতির স্বরূপ অন্বেষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা ও সংস্কৃতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো- চিন্তা-চেতনা, অভ্যাস ও চর্চাকে বদলে দেয়া। সংস্কৃতি হলো আত্মার পরিশুদ্ধি। তাই বলা হয়ে থাকে- যে জাতি যত বেশি সাংস্কৃতিকমনা, সে জাতি তত বেশি শিক্ষিত। তাই সংস্কৃতিকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতি এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতির গতিশীলতার পশ্চাতে যেমন আছে শিক্ষা, তেমনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করে সংস্কৃতি। কোনো শিক্ষাই পূর্ণ হয় না, যদি তাতে সাংস্কৃতিক শিক্ষা যুক্ত না হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজ থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা নেয়া উচিত।

সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিদীপ পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক মেধা ও মনন বিকাশে কাজ করছে। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক পাঠদানও করা হয়। শুধু তাই নয় তাদেরকে প্রকৃতির সাথে পরিচিত করার জন্য প্রকৃতি পাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়।

শিসক সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়- যে পরিবারে শিশুকে সাহায্য করার মত কেউ নেই, এমনসব পরিবারের ২০-২৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সিদীপের কর্ম-এলাকার বিভিন্ন গ্রামে এক বা একাধিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। স্কুল ছুটির পর গ্রামের কোন বাড়ির বৈঠকখানা, বারান্দা, কাছারি, কোন ঘর বা বাড়ির আঙ্গিনায় সুশীতল গাছের ছায়ায় শিশুদের পাঠদান করা হয়। গ্রামেরই কোন শিক্ষিত গৃহবধূ বা কলেজ-পড়ুয়া কোন ছাত্রী এই পড়া শিখিয়ে দেয়ার কাজটি করে থাকেন। এটি একটি সহায়ক কর্মসূচি। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের কর্মসূচি। দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি।

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ কার্যক্রমের ফলে শুধু যে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে তাই নয়, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের আচার-আচরণে প্রচুর গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এখন আগের চেয়ে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মা-বাবা ও বড়দের শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়। সন্তানের এ জাতীয় পরিবর্তনে বাবা-মা খুশি। ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তাদের সন্তানদের কেন্দ্রে পাঠানোর আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সুস্থ-নির্মল ও দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও শিশুশিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯এও ২১-২৬ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রবীণ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া বলা, বিভিন্ন খেলাধুলা ছাড়াও অনুষ্ঠানে এলাকার একজন বয়স্ক নারী ও একজন বয়স্ক পুরুষকে সম্মাননা জানানো হয়। এ বছর থেকে উক্ত অনুষ্ঠানে সংযোজন করা হয় মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের মা-বাবার হাত ধরে অনুষ্ঠানস্থলে একটি মানবশেকল তৈরি করে সকলে উচ্চস্বরে বলে- 'মা-বাবার দোয়া নেবো, অনেক বড় মানুষ হবো'।

শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে প্রায় সকল কর্মকর্তা এই এক সপ্তাহ দেশের নানা প্রান্তরে ছুটে যান।

কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই এসকল শিক্ষার্থীর পরিবেশনাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। বহু দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের ছড়া-কবিতা, নাচ, গান, অভিনয় প্রভৃতির সাবলীল উপস্থাপনা সকলকে মুগ্ধ করেছে। শিশুদের মানসিকতা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এরকম উদ্যোগ আরো বেশি বেশি নেওয়া উচিত। সিদীপের এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় শিশুদের প্রতিভা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে এলাকাবাসী এবং অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

এ বছর 'নবীনের সমৃদ্ধি প্রবীণের দানে, রাখবো তাদের সুখে ও সম্মানে' স্লোগানকে ধারণ করে কোমলমতি শিশুশিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মা-বাবা এবং সমাজের প্রবীণদের সম্মান প্রদর্শনের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে এবং সমাজে মানবিক ঐক্য গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

–শিক্ষালোক ডেস্ক

শিক্ষা কর্মসূচির সাংস্কৃতিক উৎসবে

জান্নাতুল ফেরদৌস

সিদীপ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯এও ২১-২৬ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রবীণ সংবর্ধনার আয়োজন করে।

আমার গন্তব্য চাঁদপুর। উনিশ সালের ২০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ছয়টায় মিরপুর ৬ নম্বরের বাসা থেকে রওনা দিলাম পুরনো ঢাকার সদরঘাটের উদ্দেশ্যে। এটিই আমার প্রথম লঞ্চযাত্রা।

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আমি যাই চাঁদপুরের তরপুরচণ্ডি, ফরিদগঞ্জ, মহামায়া ও রামগঞ্জ– এই চারটি শাখার 'প্রবীণ সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এ অংশ নেয়ার জন্য। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল আমি তরপুরচণ্ডি শাখায় অবস্থান করে বাকি সব শাখার অনুষ্ঠানে অংশ নেব।

প্রথম দিন যাই রামগঞ্জ শাখার অনুষ্ঠানে। অভিরামপুর গ্রামের শিক্ষিকা বীথি আক্তারের বাড়ির উঠোনে ছায়ানিবিড় পরিবেশে উৎসবের আমেজে শুরু হলো অনুষ্ঠান। ছোট ছোট শিশুর উচ্ছ্বাস-আনন্দ ও উৎসাহ দেখে আমার মন বারবার ফিরে যাচ্ছিল নিজের ছোটবেলায়। কোথাও না কোথাও মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম ছোটবেলার উচ্ছ্বাস-আনন্দের সঙ্গে। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, যেমন-খুশি-তেমন-সাজো, মোরগ লড়াইসহ আরও অনেক উপস্থাপনায় শিশুরা মেতে উঠেছিল। সব শিশু যেন তাদের প্রতিভার ডালি খুলে বসেছে আমাদের সামনে। চাঁদপুরে দায়িত্বরত এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ আব্দুস সামাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, পুরস্কার বিতরণী এবং সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয় এদিনের অনুষ্ঠান।

পরের দিন যাই ফরিদগঞ্জ শাখার অনুষ্ঠানে। দুপাশে সবুজ সমারোহের মধ্য দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে চাঁদপুর শহর থেকে ফরিদগঞ্জের দিকে। শাখা অফিসে পৌঁছে সবার সঙ্গে পরিচয়ের পর অনুষ্ঠানস্থলে চলে গেলাম। এখানকার অনুষ্ঠানে শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সাংস্কৃতিক সপ্তাহের অনুষ্ঠানে এবারই প্রথমবারের মতো মা-বাবা/অভিভাবকদের সম্মান জানানোর পর্বটি সংযোজিত হয়েছে। এলাকার অভিভাবক, গ্রামবাসী, স্থানীয় গণ্যমান্য সকলেই এই পর্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নাচ, গান, আবৃত্তি, ছড়া, মোরগ-লড়াই, বিস্কুট দৌড় সবকিছুই ছিল এই অনুষ্ঠানে। শিশুরা দারুণ উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছে। প্রাণ ভরে উপভোগ করেছে গ্রামবাসী। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরের চারদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান ছাড়াও সমিতি পরিদর্শন, স্টাফ মিটিং, দাপ্তরিক কাগজপত্র যাচাই ও সংরক্ষণ এবং ব্রাঞ্চ অফিস পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশ নিয়েছি। তরপুরচণ্ডি শাখার হামানকর্দি ও হোসেনপুর সমিতিতে গিয়েছি। সদস্যদের সাথে সামাজিক ভোগ্যপণ্যসহ আমাদের অন্যান্য সেবা নিয়ে আলোচনা করেছি।

২৫ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান সম্পর্কে স্থানীয় বাংলা সংবাদপত্র "চাঁদপুর খবর" এবং ইংরেজি সংবাদপত্র "চাঁদপুর টাইমস" আলাদাভাবে ছবিসহ দুটো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সাতদিনের অনুষ্ঠান শেষে এবার ফেরার পালা। ২৭ ডিসেম্বর, শুক্রবার, সকালে চাঁদপুর থেকে রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। ছোট শিশুদের হাসিমাখা মুখ, সমিতি সদস্যদের সঙ্গে পুকুরপারের উঠোনে বসে সকালের আলাপচারিতা, ব্রাঞ্চে কর্মীদের আন্তরিকতা, মোহনার দৃশ্য, ক্যাফে ঝিল রেস্তোরার চমৎকার চা– এমন ছোট ছোট অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সাথে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছালাম।

আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা

নাহিদা হক

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' বইটি বিভিন্ন জনের লেখার সংকলন। এতে শিক্ষাবিষয়ক নানাদিক ও বিভিন্ন মত উঠে এসেছে।

বইটিতে ঔপনিবেশিক আমল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে সরকারের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও অবদান রয়েছে। শিশুদের মানবিক বিকাশে এবং উন্নত জীবনযাপনে শিক্ষার সাথে সাংস্কৃতিক চর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ধারাবাহিক জ্ঞানচর্চা যেমন একজন শিশুকে ভবিষ্যতের প্রাজ্ঞ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তেমনি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চাও কোনো শিশুকে বিবেকবান-নীতিবান করে তুলতে সহায়তা করে। বইটি পাঠের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে উন্নত দেশ জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেখানকার শিশুদের গুণাবলীর বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারি। আদর্শ সমাজ গঠনে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও নারীশিক্ষার পথে বাধা এবং সে বাধা অতিক্রম করতে হলে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, সমাজের বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য শিশুদের মনে কীরূপ প্রভাব ফেলে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এ বইয়ে কয়েকজন সমাজকর্মীর কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেমন ইব্রাহীম সোবহান, আখতার হামিদ খান, হারমেন মেইনার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ যারা বিভিন্নভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

বিষয়ভিত্তিক পাঠ ও চারু-কারু শিক্ষার সমন্বয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশুদের সঠিক ও সার্বিক বিকাশ সম্ভব। একটি উল্লেখযোগ্য লেখা 'সের্গেই মিখালকভের গল্প: অবাধ্যতার আনন্দ' যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন স্বাধীনতা কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে না। আরও একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে

প্রকাশক: প্রকৃতি ও সিদীপ
প্রচ্ছদ: দেওয়ান আতিকুর রহমান
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯
পৃষ্ঠা: ১২৮
মূল্য: ২৪০ টাকা

রিক্সাওয়ালা ময়ছেরের সততা। যিনি একজন দরিদ্র রিক্সাচালক হয়েও নিজের সততাকে ঠিক রেখেছেন। তার এই সততা আমাদেরকে সৎ হবার শিক্ষা দেয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষায় এতটাই হস্তক্ষেপ করেন যে, একজন শিক্ষার্থী তার নিজের পছন্দানুযায়ী কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে পড়তে পারে না। অভিভাবকদেরকে তাদের পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে খুশি করতে না পারার কারণে কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। তাই আমাদের বোঝা উচিৎ যে, শিশুদেরকে তাদের নিজের মতো বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

বইটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাক্ষরতা ও সনদপত্র নিয়ে আলোচনা। আমাদের সমাজে শিক্ষার চেয়ে সনদপত্রের প্রতিই অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। একটি সনদপত্র কখনও কোনো মানুষের প্রকৃত শিক্ষার বিশ্লেষণ হতে পারে না।

বইটিতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তা আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্যে করে। এ প্রেক্ষিতে আমারও কিছু মত রয়েছে। আর তা হলো কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। যদিও আমাদের দেশে কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ আছে, প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে একে আরও প্রসারিত করতে হবে। একটি উন্নত রাষ্ট্র ও উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সার্বজনীন সাক্ষরতা, পরীক্ষায় ভালো ফল, যথার্থ সনদপত্র ও প্রকৃত শিক্ষা প্রয়োজন।

লেখক: সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, ভোলাচং ব্রাঞ্চ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত 'আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে' বইটি অনেকের চিন্তাকে ধারণ করে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের এবং মূলধারার ও মূলধারার বাইরের নানারকম উদ্যোগের কথা এতে জানা যাবে। প্রতিফলিত হয়েছে কিছু সংকটের দিক।

সেইসঙ্গে জীবনে ও সমাজে শিক্ষার প্রভাব, প্রকৃত শিক্ষার রূপ, মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। চিন্তার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বইটি। ব্যতিক্রমী ভাবনার প্রতিফলন আছে এ বইয়ে।

শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন-২০২০

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত হয় শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, বার্ড-কুমিল্লার প্রাক্তন মহাপরিচালক ফজলুল বারি, লেখক ও গবেষক শাহজাহান ভূঁইয়া, লেখক সালেহা বেগম, লেখক ও সমাজকর্মী সিরাজুদ দাহার খান, কবি সৈকত হাবিব, ভাস্কর বিপ্লব দত্ত, চলচ্চিত্র পরিচালক নোমান রবিনসহ অনেকেই। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

সম্মিলনে সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে'র ভূমিকা, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, এনজিওদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সারাক্ষণই চলেছে প্রাণবন্ত আলোচনা, সমালোচনা ও যুক্তি-তর্ক। কবি ও প্রকাশক সৈকত হাবিব বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকার সমালোচনা করেও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে এনজিওরা দ্রুত গতিতে কাজ করে থাকে। অনেকের আলোচনায় এটা উঠে আসে যে, এনজিওদের কাজের মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র মানুষ গুরুত্বপূর্ণ সেবা লাভ করে ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে থাকে।

বিশিষ্ট শিক্ষক বিদুৎ কুমার রায় বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করতে হলে আমাদের পাঠ্যবইয়ের ওপর জোর দিতে হবে। এখনকার শিক্ষার্থীরা গাইড বই বা নোট বইয়ের উপর জোর দেয়ার কারণে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এ+ পাওয়ার প্রতিযোগিতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধুমাত্র রেজাল্টের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে মেধার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও সকলে শিক্ষা ও এনজিওদের কার্যক্রমের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এ সম্মিলনে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত 'আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে' বইটি নিয়েও আলোচনা করা হয়। শিল্পী তানজিল হাসান রাতুল গান গেয়ে শোনান। সবশেষ খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক নোমান রবিনের Blossoms From Ash ছবিটি দেখানো হয়। চলচ্চিত্রটি সকলকে মুগ্ধ করে।

শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করতে হলে আমাদের পাঠ্যবইয়ের ওপর জোর দিতে হবে। এখনকার শিক্ষার্থীরা গাইড বই বা নোট বইয়ের উপর জোর দেয়ার কারণে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

শোক ও স্মরণ সভা

১২ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিকাল ৩.০০ টা

শনিবার, জুম মিটিং

https://us02web.zoom.us/j/87281235709

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, সিদীপ (CDIP)
সিডিএফ গভর্নিং বডির সদস্য,
এবং সিডিএফ-এর প্রথম নির্বাহী প্রধান

২২ আগস্ট ২০২০, সকাল ৭.০০টা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

আয়োজনে
ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)

ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিকাল ৩টায় সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক সদ্যপ্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিয়ে একটি ভার্চুয়াল শোক ও স্মরণ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় মাননীয় মন্ত্রী, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন চিন্তক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক দুইজন গভর্নর ও সেক্টরের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শোক ও স্মরণ সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. আব্দুল আউয়াল। সভা সঞ্চালন করেন 'অন্তর'-এর প্রিন্সিপ্যাল এ্যাডভাইজর জনাব মো. এমরানুল হক চৌধুরী। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য (তাদের বক্তব্য প্রদানের ক্রম অনুসারে) সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরা হলো।

জনাব এম এ মান্নান

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমরা সবাই যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আছি তার মধ্যে মোহাম্মদ ইয়াহিয়াও একজন ছিলেন। অবাক লাগে তিনি লেখকও ছিলেন, তিনি বইও লিখেছেন। মহাকাশে মহাজয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনী রচনা করেছেন আমাদের সন্তানদের জন্য। তারপর তার কাব্যগ্রন্থও আছে, কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি। আমি যেটা বলতে চাই, তিনি একজন বহুমুখী মানুষ ছিলেন, তার অনেক আগ্রহ ছিলো জীবনের ওপর। কত সংস্থায় তিনি জড়িত ছিলেন। এত অল্প সময়ে তিনি এতগুলো কাজ করে গেছেন, তা তার একটা শক্তির পরিচায়ক।

মি. অমলেন্দু মুখার্জী

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)

দেশের একটা স্বনামধন্য এমএফআইয়ের সঙ্গে ইয়াহিয়া ভাই জড়িত ছিলেন। সেখান থেকে এসে স্বল্পপুঁজিতে স্বতন্ত্র এমএফআই নিয়ে উনি এই সেক্টরে কাজ শুরু করেন। এই এমএফআই এখন এমআরএর বিচারে ৫ম থেকে ৭ম অবস্থানে আছে। মোটামুটি টপ টেনের মধ্যে আছে।

জনাব জহিরুল আলম

নির্বাহী পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

ইয়াহিয়া ভাইয়ের সঙ্গে আমার ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সালের দিকে পরিচয়। এই যে লকডাউন শুরু হলো তখন প্রায় প্রতিদিনই

তাৎক্ষণিক শোক ও স্মরণ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

জনাব এম এ মান্নান

মি. অমলেন্দু মুখার্জী

জনাব জহিরুল আলম

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

জনাব মো. আব্দুল করিম

জনাব ফজলুল বারি

জনাব মোঃ এনামুল হক

মি. সুখেন্দ্র কুমার সরকার

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন

জনাব জাকির হোসেন

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

জনাব খুরশিদ আলম পিএইচ.ডি

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

প্রফেসর ড. হোসনে-আরা বেগম

জনাব আব্দুল হাই খান

জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী

জনাব মো. এমরানুল হক চৌধুরী

জনাব মো. আব্দুল আউয়াল

জনাব মুর্শেদ আলম সরকার

আমাদের কথা হয়েছে। কীভাবে আমাদের উত্তরণ ঘটবে, কীভাবে আমরা নতুনভাবে আমাদের প্রোগ্রামকে সাজাবো, কীভাবে আমাদের স্ট্র্যাটেজিকে চেঞ্জ করবো, এরপরে কী হবে, প্যান্ডেমিকের সময় কীভাবে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াবো স্বাস্থ্যসেবা ও রিলিফ নিয়ে, মাইক্রেডিট নিয়ে আমরা মানুষকে কীভাবে সেবা দিবো–এসব নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই আলাপ হয়েছে।

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

আমি যে ইয়াহিয়া সাহেবকে খুব নিবিড়ভাবে জানতাম বা চিনতাম এ দাবি আমি করবো না। তবে কাজের সুবাদে তার সঙ্গে আমার নানা জায়গায় নানা সময় দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। এবং যেহেতু আমি এই সেক্টর নিয়ে ভাবি, সুতরাং এ বিষয় নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। নিভৃতচারী স্বল্পভাষী এই মানুষটি মানুষের কল্যাণে বরাবরই নিবেদিত ছিলেন। তিনি মানুষকে মানুষ বলেই মনে করতেন। এই মানুষ প্রাণবন্ত, স্বপ্নকাতর, মুক্তিকামী। এই মানুষের আছে অপরাজেয় প্রাণশক্তি। লড়াকু এই মানুষগুলোর সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার জন্য নানা সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিলো তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। জনাব ইয়াহিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের মূলে ছিলেন প্রান্তজন। নিরন্তর তিনি চেষ্টা করে গেছেন এদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার দরজাগুলো খুলে দিয়ে দারিদ্র্য নামের সভ্যতার কলঙ্ক থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে সকল আয়োজন সম্পন্ন করবার। আর এক্ষেত্রে অনেকটাই সফল হতে পেরেছিলেন তিনি। এদের জন্য লড়বার এই অনুপ্রেরণা ও সাহস তিনি পেয়েছিলেন একাত্তর থেকে। আমরা জানি সাধারণ মানুষের সন্তানেরাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অংশ। আর তিনি তাদের সঙ্গেই কাজ করছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ঐ চ্যালেঞ্জিং সময়ে। সেজন্য তিনি হানাদার বর্বর পাকিস্তানি বাহিনির হাতে ধরাও পড়েছিলেন। বড়ই সৌভাগ্য আমাদের যে তিনি সেসময় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে এক অদৃশ্য শত্রু তাকে এই সময়টায় কেড়ে নিলো। মনেপ্রাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহন করে চলেছেন তিনি আজীবন। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি এবং অনেকের আলোচনা থেকে জানলাম শিক্ষাজীবন শেষ করেই তিনি গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য লাগসই উপায় বের করতে গবেষণায় নেমে পড়েছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস ওভারসিস বা সিইউএসও এবং বার্ডের একটি যৌথ অ্যাকশন রিসার্চে যুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি যোগ দেন প্রশিকায়, তারপর তিনি ইউএনডিপিসহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার হয়ে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের নানা অঞ্চলে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি সিডিএফের প্রথম নির্বাহী/প্রধান ছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার এবং তখনও তাঁর কাজের অনেক সুফল আমরা ভোগ করেছি। এরপর তিনি গ্রামীণ ট্রাস্টেও জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে প্রায় তিন বছর কাজ করেছেন। তবে আমৃত্যু তিনি নীরবে কাজ করে গেছেন তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান সিদীপে। আমরা লক্ষ্য করেছি তার প্রতিষ্ঠান সিদীপকে মানব-উন্নয়নের এক সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সিডিএফের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল আউয়ালের কাছ থেকে আমি জেনেছি তিনি গ্রামের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এই কর্মসূচি এখন একটি মডেলে রূপ নিয়েছে। সিডিএফ পরিবারের এ সদস্যটির সাফল্যের জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। মনের কথা লেখায় প্রকাশ করবার এক বিরল গুণের অধিকারীও ছিলেন জনাব ইয়াহিয়া। আমরা জেনেছি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা বিশেষ করে শিক্ষাভাবনা, নাটকসহ অনেক কিছুতেই তিনি তার মেধা প্রয়োগ করেছেন। তিনি শুধু লেখেননি, শিক্ষালোক নামের একটি বুলেটিনও নিয়মিত সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন। দেশে ও বিদেশে মানব-উন্নয়নের নানা বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। বহুমাত্রিক এই মেধাবী মানুষটি করোনাকালে হঠাৎই চলে গেলেন। এই সময়টায় তার মত একজন অভিজ্ঞ মানুষের চিন্তাচেতনা আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিলো। আপনারা জানেন যে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটগুলো যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। সময়টা কিন্তু এখন অংশগ্রহণের। অংশীজনেরা একসঙ্গে কাজ করলেই এ সংকট থেকে আমরা মুক্তি পাব। সৌভাগ্যবশত ইতিমধ্যেই অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের যে চারা আমরা তাদের পাতা দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ অন্য দেশের চাইতে সাহসের সাথে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সাফল্য দেখাতে শুরু করেছে। সুতরাং আগামী দিনগুলোতে জনাব ইয়াহিয়ার মতো যারা সৃজনশীল উদ্যোক্তা, সামাজিক উদ্যোক্তা তাদেরকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। হঠাৎ করে তার এই বিদায়ে উন্নয়নভুবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়।

জনাব মো. আব্দুল করিম

সিনিয়র অ্যাডভাইজার, ব্র্যাক ও প্রাক্তন মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উন্নয়ন ও মুক্তির সারথি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া–আমার মনে হয় এ দুটি শব্দেই উনার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। জনাব ইয়াহিয়া এই সেক্টরের একজন প্রথিতযশা নেতা ছিলেন এবং তিনি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জনেগাষ্ঠীর মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। গ্রামীণ অর্থায়নের শতকরা প্রায় আশি ভাগ আমাদের এমএফআইগুলো করে থাকে। যেখানে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে তিন কোটি লোকের সেবা দেওয়া হয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সেক্টর। ইয়াহিয়া ভাইয়ের দীর্ঘদিনের পদচারণা

এই সেক্টরকে শক্তিশালী করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে তিনি ভূমিকা রেখেছেন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যে মুক্তি দেওয়া সম্ভব সেই প্রমাণ তিনি রেখেছেন। ইয়াহিয়া সাহেব শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে একটি মডেল স্থাপন করেছেন। সেটি হলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ে তাদের জন্য স্কুলে বাড়ি থেকে পড়ে আসার জন্য যে পড়াটা দেয়া হয়, সেটা পড়ে আসার সুযোগ তারা পায় না। কারণ তাদের পিতামাতা নিরক্ষর এবং প্রাইভেট পড়ার সুযোগ নাই। ফল হলো তারা পরের দিন আর স্কুলে আসতে চায় না, কারণ শিক্ষক তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে ও তারা জবাব দিতে পারবে না। এভাবে তারা ঝরে পড়ে যায়। ইয়াহিয়া সাহেব চিন্তা করলেন যে, ক্লাসের পরপরই যদি একটু কোচিংয়ের মতো গ্রামের কোনো শিক্ষিত মেয়েকে দিয়ে তাদেরকে পড়ানো হয় তারা খুশি মনে পরের দিন স্কুলে আসবে, খুশি মনে ক্লাস করবে, শিক্ষকের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। এতে করে ড্রপ-আউট কমে যাবে। এই শিক্ষাকর্মসূচিটা অত্যন্ত সফল একটি মডেল। আমরা পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশনের যে সমৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি, সেখানে এই মডেলকে অন্তর্ভুক্ত করেছি আমাদের প্রোগ্রাম হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এটি একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পিকেএসএফের সকল এনজিওর মাধ্যমে আমরা এ মডেলটা চালু করেছি। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তার আদর্শ আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। কভিডের দুঃসময়ে লক্ষ লক্ষ লোক যে বেকার হচ্ছে, এই সময়ে মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে জনাব ইয়াহিয়ার মতো লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিলো।

জনাব নার্গিস ইসলাম

সিদীপের গভর্নিং বডির সদস্য

ইয়াহিয়া ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এ ম্যান উইথ এ গোল্ডেন হার্ট। তাকে আমি কোনো সময় গোমড়া মুখে দেখিনি, সবসময় সে হাসিখুশি থাকতো। কারো সঙ্গে সে কোনোসময় উচ্চস্বরে কিংবা রাগ হয়ে কথা বলেনি। সবসময় মানুষের দুঃখকষ্টের কথা জানতে চাইতেন। এ ধরনের মানুষ আজকাল আমরা খুব একটা দেখতে পাই না। কিভাবে প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায় সমসময় চিন্তা করতেন এবং আমাদের সিদীপ গভর্নিং বডির সকলের সঙ্গে আলাপ করতেন। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো সবার প্রচেষ্টায় সমাজে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব এবং দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটানো সম্ভব।

জনাব ফজলুল বারি

মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া-এর বড় ভাই

আপনারা যারা আমার ছোটভাই ইয়াহিয়ার কাজের সঙ্গে পরিচিত তারা একত্রিত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ভাইবোনের মধ্যে আমরা তাকেই নেতা মানতাম। সে সবার খোঁজখবর নিত এবং সাধ্যমত সহযোগিতা করত। সে আমার ছোট ছিলো কিন্তু তার এসব গুণের জন্য আমি তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী তার ওপর বিশ দিনের মতো যে নির্যাতন করেছিলো সে বিষয়ে আমি তাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনিও জানতেন না, কারণ তিনিও ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করেননি। তবে শুনেছি তার পা দুটো ঝুলিয়ে চাবুক মারা হতো। আমার ধারণা তার ওপর এই শারীরিক নির্যাতন পরবর্তীতে তার স্বাস্থ্যের ও মনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। হয়তো সেদিনের সেই নির্যাতন তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

জনাব মোঃ এনামুল হক

চীফ অপারেটিং অফিসার, আশা ইন্টারন্যাশনাল

ইয়াহিয়া ভাই আমাদের আশার সাধারণ পরিষদের সদস্য ছিলেন। উনি ছিলেন আমার অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আমার মেন্টর। হি ওয়াজ দি বেস্ট ট্রেইনার। আমার জীবনে অনেক কিছু উনার কাছ থেকে পাওয়া। ব্যক্তিগত জীবনে উনি অত্যন্ত সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত রুচিবোধ ছিলো উনার। আত্মসম্মানবোধ ছিলো অত্যন্ত প্রখর। উনার জীবনযাপন ছিলো খুবই সিম্পল এবং প্রচারবিমুখ। নীরবে নিভৃতে কাজ করতেন। কাজ-পাগল মানুষ ছিলেন উনি। কারো সঙ্গে বিরোধে জড়াতেন না। উনার ডেভেলপমেন্ট স্টেপগুলো ছিলো অত্যন্ত ফোকাসড, প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে উনি আগাতেন। একসময় কুমিল্লা প্রশিকার খুব খারাপ অবস্থা ছিলো, তখন ইয়াহিয়া ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হলো। ইয়াহিয়া ভাই দায়িত্ব নিয়ে প্রশিকাকে পুনরুজ্জীবিত করার পরেই আবার যারা ছিলো তারা তার দায়িত্ব কেড়ে নিলো। তারপর একটু অভিমান করেই উনি চলে গেলেন ইউএনভিতে। এরপর উনি বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছেন। যেখানেই কাজ করেছেন সেখানে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ইনোভেশন রেখে এসেছেন। উনি আমাকে হাতেকলমে শিখিয়েছেন অনেক কিছু। উনার মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন উপদেষ্টা, একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারিয়েছি। যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে তা পূরণ হবার নয়, কারণ ইয়াহিয়া ভাইয়ের মত মানুষ লাখে এক-দুইজন জন্মে। আমি একটা কথাই বলবো, উনি তার কর্মীদেরকে বলতেন, তোমরা প্রতিষ্ঠানটাকে বাঁচিয়ে রাখো, আমি তোমাদের পরিবারকে দেখবো। আমি সিডিএফকে অনুরোধ করবো, আমরা উনাকে নিয়ে একটা স্মরণিকা বের করতে পারি কিনা। আমরা যারা উনাকে চিনতাম তারা যদি উনাকে নিয়ে আর্টিকেল লিখি এবং সিডিএফ যদি একটা স্মরণিকা বের করে, আমার যত সহযোগিতা লাগে আমি করবো।

মি. সুখেন্দ্র কুমার সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান, সিডিএফ ও নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস বাংলাদেশ

ইয়াহিয়া ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ব্র্যাক অফিসে, প্রয়াত আমিন ভাইয়ের মাধ্যমে। তারপর আমি ইয়াহিয়া ভাইয়ের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয়ের সুযোগ পাই ১৯৯৬ সালে। উনি

সিডিএফের প্রথম নির্বাহী প্রধান, তখন আমি সিডিএফের চেয়ারম্যান। উনি সিডিএফে এক বছর ছিলেন। এই এক বছর আমি উনার সঙ্গে গভীরভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তখনও কিন্তু উনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, মাঝেমাঝে অফিসে অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কিন্তু কাজ উনি ছাড়েননি। উনি অসুস্থ হলে একটু রেস্ট নিতেন, তারপর যে কাজটা উনার করার কথা সেটা করে যেতেন। উনি সিডিএফকে খুবই ভালবাসতেন। যার ফলে সিডিএফ থেকে চলে গেলেও উনি এর সাধারণ পরিষদের সদস্য ছিলেন, ও পরে এর গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। সিডিএফকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর কন্ট্রিবিউশন ইয়াহিয়া ভাইয়ের আছে।

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন

সাবেক চেয়ারম্যান, সিডিএফ ও পরিচালক (অর্থ), বুরো বাংলাদেশ

ইয়াহিয়া ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৯৬ সালের দিকে। আমি তখন সিডিএফের ট্রেজারার ছিলাম। আমার সঙ্গে শেষ কথা হওয়ার পাঁচ-ছয়দিন পর উনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এই সেক্টর নিয়ে অনেকে মিলে একটা মিটিং করার তারিখ আমরা ঠিক করেছিলাম যা আর হলো না। আমার কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হলেই আমি উনার কাছে চলে যেতাম। কারণ উনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক নলেজ রাখতেন। এগুলোর সুবিধা নেওয়ার জন্য মাঝেমাঝে উনার কাছে যেতাম।

জনাব জাকির হোসেন

নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ ও চেয়ারম্যান, এনজিও ফেডারেশন

ইয়াহিয়া ভাই খুবই সহনশীল একজন মানুষ ছিলেন, সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। উনার কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং ওয়ে অব থিংকিং অনেকের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। উনি যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিলেন সেটা অনেকেই গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে পিকেএসএফের পার্টনাররা সেটা বাস্তবায়ন করছে। আমি ইয়াহিয়া ভাইকে চিনি যেহেতু আমি সিডিএফের জন্মলগ্ন থেকে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। উনি যখন প্রথম এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সেই সময় থেকেই উনার সঙ্গে পরিচয়। এর আগে গ্রামীণ ট্রাস্টে একবার দেখা হয়েছিলো। উনি ১৯৯৫ সনে সিদীপ গড়ে তোলেন এবং অল্প সময়েই প্রতিষ্ঠানটিকে একটা বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এখানে আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলছি যে নাকি সারা জীবন কাজ করেছে অন্যের জন্য, নিজের স্বার্থে না। যিনি সারাজীবন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আমরা এই যে জুম মিটিংটা করলাম এখানে প্রত্যেকের কথা রেকর্ড করে যদি লিখে সম্পাদনা করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা যায় এবং এই ভিডিওটাকে এডিট করে ইউটিউবে দেওয়া যায় তবে অসংখ্য উন্নয়নকর্মী ইয়াহিয়া ভাই সম্পর্কে জানতে পারবে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

ইয়াহিয়াকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতাম। একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, তার কাজ ছিলো মাল্টিডাইমেনশনাল। বিশেষ করে তার শিক্ষা প্রোগ্রামটার ব্যাপারে আমি খুবই ইমপ্রেসড। শিক্ষালোক নামে যে একটা বুলেটিন সে বের করতো সেটা আমার কাছে আসতো, আমি দেখতাম। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর যে আগ্রহ সেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জনাব খুরশিদ আলম পিএইচ.ডি

নির্বাহী পরিচালক, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আমরা একসঙ্গে স্ট্যাটিকসে মাস্টার্স করেছি একই বছরে। ছাত্রজীবন থেকেই সে অনেক পড়াশুনা করতো, তার জানার আগ্রহ ছিলো অনেক বেশি। সে অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং অল্প কথা বলতো, বেশি আলোচনার মধ্যে থাকতো না, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। কবিতা লিখতো ছাত্রজীবন থেকেই। পরবর্তীতে আমি যখন কোডেকে, ও আমাকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিতো। একাত্তর সালে সে যে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছে এটা কিন্তু সে কখনও বলতো না, প্রচার করতো না। আমরা তো একটু হলেই বলি এই করেছি, সেই করেছি ও এগুলো বলতো না। আজকের এই আলোচনা এবং ওর উন্নয়ন ভাবনাগুলো নিয়ে যদি একটা পাবলিকেশন করা যায়, তবে আরও অনেকে উপকৃত হবে।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া এনজিও সেক্টরে এরকম একজন মানুষ যে একদম নিবেদিত-প্রাণ, অন্যদিকে ক্রিয়েটিভ, চিন্তাশীল এবং অমায়িক। আর একটা দিক হলো এত বড় বড় কাজ করেছে কিন্তু সে ছিলো প্রচারবিমুখ। ও যখন মারা গেল, আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম। আমার কাছে ওর সব পাবলিকেশন দিয়ে যেত, তার মধ্যে ফটোগ্রাফি একটা বড় দিক ছিলো, যেমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে দুই-তিনটা ভলিউম বের করেছে, কিন্তু কোথাও তার কোনো ছবি খুঁজে পেলাম না। আমি ওকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতাম। আমি যখন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। প্রথম পরিচয়ে ও আমার ডাকনাম ধরে ভাই বলে সম্বোধন করলো, সে ডাকনামটা আমি এখন বলবো না। তখন মনে পড়লো আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা স্কুলে পড়ি তখন ও আমার দুই-তিন ক্লাশ নিচে পড়তো এবং কিছুদিন আমাদের পাশের বাসায়ই ছিলো। অত্যন্ত জীবনীশক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলো সে। পাকবাহিনির অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, আফ্রিকাতে হৃদরোগে অসুস্থ হয়, কিন্তু কখনো দমেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি যেটা গ্রামের ভলান্টিয়ারদেরকে নিয়ে করছে, এটা তো এখন একটা

মডেল হয়ে গেছে। আমি ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে যখন বই লিখলাম তার সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং অনেক কিছু জেনেছি। সে ছিলো একদিকে অত্যন্ত জ্ঞানের মানুষ, আবার মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতাও পুরোপুরি ছিলো।

প্রফেসর ড. হোসনে-আরা বেগম

নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

তিনি ছিলেন একজন শান্ত ও ন্যায়বাদী মানুষ। তার মৃত্যুতে আমাদের একজন পরামর্শক চলে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী মানুষ।

জনাব আব্দুল হাই খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ট্রাস্ট

উনি একজন অমায়িক স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। উনার লেখার হাত ছিলো, বইও লিখেছেন। উনি যে প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন তার সঠিক কাজের মধ্য দিয়েই উনি বেঁচে থাকবেন।

আশার প্রেসিডেন্ট জনাব সফিকুল হক চৌধুরী ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এ স্মরণসভায় তাদের বার্তা পাঠান। যা পাঠ করে শোনান যথাক্রমে আশা'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এ্যাকাউন্টস, ফিন্যান্স, এমআইএস এন্ড এফআরএ) জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. আব্দুল আউয়াল।

জনাব মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট, আশা

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার মৃত্যুতে আমরা হারিয়েছি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্বজনকে। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সত্যিকার অর্থেই আত্মার সম্পর্কে পরিণত হয়েছিলো। দুই হাজার সাল থেকে অদ্যাবধি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশার সাধারণ পরিষদের সদস্য। জনকল্যাণে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত-প্রাণ মানুষ। দরিদ্র মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি সবসময় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। সিদীপ ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আশার পার্টনার সংস্থা ছিলো। আশার সঙ্গে সিদীপের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত চমৎকার এবং হৃদ্যতাপূর্ণ। জনাব ইয়াহিয়া সিদীপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে। তার প্রতিষ্ঠান স্বল্পসময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। এটা সম্ভব হয়েছে তার নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ গুণাবলীর কারণে। তিনি সিদীপের কর্মীদেরকে জনকল্যাণে আত্মনিবেদনে উজ্জীবিত করতে দারুণভাবে সক্ষম হয়েছিলেন। এরফলে সিদীপ দ্রুত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। জনাব ইয়াহিয়া তার প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। এই প্রয়াসের ফলে দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ পরিবারের শিশুদের লেখাপড়া শেখার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসগঠন এবং স্কুলের পাঠ তৈরিতে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়া অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশা প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। আশা এই কর্মসূচি সারা দেশে ছড়িয়ে দেয় যা মূলত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার চিন্তাপ্রসূত একটি কার্যক্রম। এ কার্যক্রম গ্রহণে তিনি আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। জনাব ইয়াহিয়া ছিলেন একজন চিন্তাশীল, রুচিবান এবং কর্মনিষ্ঠ মানুষ। এসব গুণাবলী তিনি তার প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার সিদীপ পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিলো। তার প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। দারিদ্র্য নিরসন কাজে তিনি উন্নত রুচি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার এক অভিনব সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। স্বল্প সময়ে সিদীপ বাংলাদেশের মধ্যে একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভের পিছনে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জনাব ইয়াহিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ও চেয়ারম্যান, ইউনূস সেন্টার

I am deeply shocked to hear the sad news. Yahiya was a person of many qualities. Best of these is his empathy for people at the bottom. He believed that some meaningful changes can be brought to them if we keep trying. He believed in the power of individuals to bring major changes in the society. I fondly remember my brief experience of working together with him. I will miss him. Please give my heartfelt condolences to his family members. May Allah grant him eternal peace.

জনাব মুর্শেদ আলম সরকার

চেয়ারম্যান, সিডিএফ ও নির্বাহী পরিচালক, পপি

আমরা জানি উনি উন্নয়নের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। অনেক লেখাপড়া করতেন এবং উনার শিক্ষা মডেলটা আমাদের উন্নয়ন জগতে কাজে এসেছে, আমরা বাস্তবায়ন করছি। উনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে সবার সাথে কাজ করতেন। সিডিএফে আমাদের সঙ্গে যখন বসতেন সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। উনি চাইতেন সবার সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুতে সেক্টরের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে অনেক সময় লাগবে।

সিডিএফের চেয়ারম্যান সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শোকসভাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০১৪ সালে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপি উন্নয়ন মেলায় ২৭ অক্টোবর Building Human Capacity : Education Program for the Excluded শীর্ষক সেমিনারে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনে-আরা বেগম এবং সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। (ছবিতে সর্বডানে) তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো 'মানব-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীকে সামাজিক সহায়তা'। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী। সেমিনারটিতে সভাপ্রধান ও সঞ্চালক-এর দায়িত্ব পালন করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

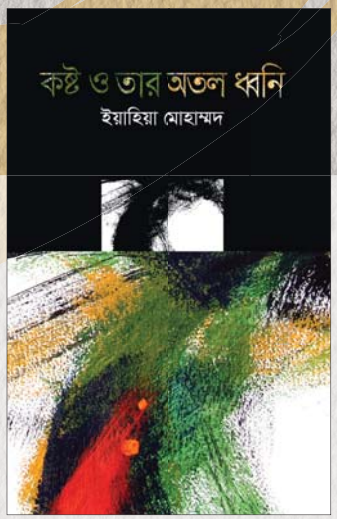

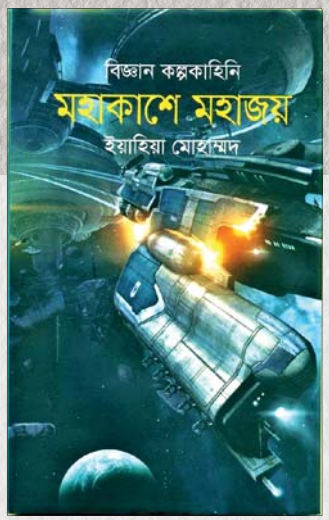

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার বিজ্ঞান কল্পকাহিনী
'মহাকাশে মহাজয়' এবং কাব্যগ্রন্থ
'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি'।
বই দুটি প্রকাশ করেছে দিব্যপ্রকাশ।